চিরশান্তির পথ



ড. মোহাম্মদ শামীম খান

চিরশান্তির পথ

ড. মোহাম্মদ শামীম খান

ঘাস প্রকাশন

চিরশান্তির পথ
ড. মোহাম্মদ শামীম খান

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২৫

প্রকাশক
নাজমুল হক নাজু
ঘাস প্রকাশন, মাছুদিঘির পাড়, সিলেট
ghas.prakashan@gmail.com
+৮৮০১৭১১৩৩৬৪০৭

মুদ্রক
ছাপাকানন, সিলেট
দূরভাষ: +৮৮০১৯৭১৩৩৬৪০৭

পরিবেশক
বাতিঘর, নিউনেশন, সিলেট;
পাঠক সমাবেশ, ঢাকা
অনলাইন পরিবেশক : রকমারি ডট কম

প্রচ্ছদ: লেখক

৳ ২৫০/-

The Path of Eternal Peace by Dr. Mohammed Shamim Khan
Published by Ghas Prakashan, Masudighir Par, Sylhet, Bangladesh.
Price ৳250.00, £10; US$15; First Edition June 2025

ISBN : 978-984-99987-8-5

উৎসর্গ

হযরত সালমান আল ফারসি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু
সত্যের অন্বেষণে যিনি বছরের পর বছর পরিভ্রমণ করেছিলেন

ভূমিকা

সৃষ্টিজগতের একজন স্রষ্টা আছেন। এ বিষয়ে ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। আর মৃত্যু নিয়ে তো কারোর-ই কোনো প্রশ্ন নেই- না আস্তিক, না নাস্তিক। কিন্তু মৃত্যুর পরের জীবন, এই জীবনে ধর্মের অনুসরণ নিয়ে রয়েছে নানা মত ও পথ। সৃষ্টিকর্তা একজন, মানবজাতি একটি- তাহলে এতো ধর্ম কেন? নানা ধর্মের নানা বিধান- একটির সঙ্গে অন্যটির মিল নেই, বরং বিপরীতধর্মী ও সাংঘর্ষিক। নানা মত, নানা পথকে কেন্দ্র করে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে মানুষে-মানুষে বিবাদ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঘটছে অবিরত। ধর্ম প্রচারের অন্যায় উন্মাদনা পৃথিবীতে অনেক রক্তপাতের কারণ হয়েছে। সকল ধর্মাবলম্বীর নিজ নিজ দাবি অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তাই যদি সকল ধর্মের স্রষ্টা হন তাহলে এসব বিভেদ-বৈষম্য, দ্বন্দ্ব-কলহ, রক্তপাতের দায় কে নেবে? স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা না মানুষ? কিন্তু সৃষ্টিকর্তার জন্য এ কী করে মানায় বলুন? না, এটি মোটেও যৌক্তিক হতে পারে না।

শুদ্ধ ধর্মবিশ্বাস ও এর অনুসরণ ছাড়া পরকালে মুক্তি পাওয়া এবং এই জীবনে প্রকৃত শান্তি পাওয়া যেতে পারে না। একমাত্র স্রষ্টা কর্তৃক সৃষ্ট ধর্মের মধ্যেই চিরশান্তি ও মুক্তির সন্ধান থাকতে পারে- এই বিষয়ে নিশ্চয় কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এ বিষয়ে প্রকৃত সত্য আমরা কীভাবে লাভ করতে পারি? স্বয়ং স্রষ্টার কাছ থেকে যদি জেনে নিতে পারি তাহলে কেমন হয়? নিশ্চয়-ই এর চেয়ে উত্তম কোনো উপায় হতে পারে না। তাহলে সব সমস্যাই মিটে যায়। কিন্তু স্বয়ং স্রষ্টার কাছ থেকে কি জেনে নেওয়া সম্ভব? সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে নিশ্চয়ই এটি সম্ভব হতে পারে। এসব প্রশ্নের নির্ভেজাল জবাব খুঁজে পাওয়া ও একটি মীমাংসায় উপনীত হওয়ার প্রয়াস এই গ্রন্থ।

পরিবার, পরিজন, শুভাকাঙ্ক্ষী, প্রকাশক যারা এই কাজে নিরন্তর অনুপ্রেরণা ও সহায়তা দিয়ে গেছেন তাদের সকলের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা অশেষ।

ড. মোহাম্মদ শামীম খান
পায়রা, সিলেট
জুন ২০২৫

পাঠসূচি

স্রষ্টার থেকে আপন কেউ নেই

পৃথিবীর সকল মানুষ একই বাবা-মায়ের সন্তান, যেহেতু সবার আদি পিতা-মাতা এক। এই আদি পিতা-মাতাকে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন নামে স্মরণ করে থাকেন। যেমন, ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ বলেন- এডাম ও ঈভ, হিব্রু ভাষায় বলা হয়- আদামা ও হাওয়া, মুসলমানগণ বলেন- আদম ও হাওয়া, হিন্দুগণ বলেন- মনু ও শতরূপা। বিভিন্ন নামের এই আদি পিতা-মাতা একই ব্যক্তি। এ হিসেবে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষ একে অন্যের আত্মীয়; যেহেতু মানবজাতি একই পিতা-মাতা আদম ও হাওয়ার (তাঁদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) সন্তান।

পৃথিবীতে আমরা যাকে ইচ্ছা ভালবাসি না কেন, একদিন আমাদেরকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে। দুনিয়াকে যতই ভালবাসুন, একদিন এই দুনিয়া আমাদেরকে ছাড়তে হবে। কিন্তু স্রষ্টার সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক করলে ইহ-পরকালে কোনো বিচ্ছেদ নেই। ধর্মগ্রন্থে পড়েছি, স্রষ্টা বলেন, (১) হে আদমসন্তান, আমি সবকিছু তোমার জন্য সৃষ্টি করেছি আর তোমাকে আমার জন্য সৃষ্টি করেছি। (২) হে আদমসন্তান, আমি তোমাকে ভালবাসি, সুতরাং তোমার উপর আমার এই হক (পাওনা) রয়েছে যে তুমিও আমাকে ভালবাসবে। (২) হে আমার বান্দা, তুমি আমাকে ভুলে থাক, কিন্তু আমি তোমাকে স্মরণ রাখি। (৩) হে আমার বান্দা, আমি তোমাকে পানাহার করাই, বাঁচিয়ে রাখি, অথচ তুমি আমার নির্দেশনা অমান্য কর। (৪) হে আমার বান্দা, আমি তোমাকে সবচেয়ে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছি, অথচ তুমি তা চিন্তা কর না। (৫) হে আমার বান্দা, স্মরণ রেখো, আমি ছাড়া তোমার কোনো বন্ধু নেই।

হে মানুষ, তোমরা একদিন এই ধরায় ছিলে না। সর্বশক্তিমান স্রষ্টা তোমাদেরকে নাই থেকে সৃজন করেছেন। মায়ের পেটে কোনো বিজ্ঞানী, বাবা-মা, নেতা তোমাকে খাওয়াতে পারত না। তিনি সেখানেও তোমাকে খাইয়েছেন। কীভাবে জান? তোমার মায়ের নাভি থেকে একটি রক্তনালী বের করে তোমার নাভির সঙ্গে লাগিয়ে দিয়ে সেই রক্তনালী দিয়ে তোমার মায়ের শরীর থেকে রক্ত তোমার শরীরে

পাঠিয়ে তোমার জীবন তিনি বাঁচিয়েছেন। রক্তটা তোমার মুখে লাগান নি। মুখটাকে এভাবে পবিত্র রেখেছেন যাতে দুনিয়ায় আসার পর তাঁর বানানো এই পবিত্র মুখ দিয়ে তোমার পবিত্র প্রভুর নাম নিতে পার। মায়ের পেটের ভেতরে একটি সুরক্ষিত প্রকোষ্টে এভাবে তিনি তোমাকে তিল তিল করে বড় করে তুলেছেন। যেখানে কোনো ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া তোমাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তার পর একদিন আস্তে করে তোমাকে দুনিয়ায় বের করে এনেছেন।

তিনি তোমাকে তোমার মায়ের পেটের ভেতরেই মেরে ফেলতে পারতেন। দুনিয়ার মুখ দেখতে পারতে না। পঙ্গু-বিকলাঙ্গ করে বের করতে পারতেন। তুমি দুনিয়াতে আসার পর তোমার শরীরের সবকিছু অতি কচি ও নরম ছিল ফলে দুনিয়ার খাবার তোমার জন্য সুবিধাজনক ছিল না। তখন তুমি কী খাবে? তিনি তোমার এমন মালিক, এমন স্রষ্টা, এমন লালন-পালনকারী– তুমি দুনিয়ায় আসার পূর্বেই তোমার খাবার তিনি তোমার মায়ের শরীরে উষ্ণরূপে সংরক্ষণ করে রেখে দিয়েছিলেন। দুনিয়ায় আসার পর তুমি কখনো কখনো মলমূত্রের মাঝে পড়ে থাকতে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরে গেলেও কান্না ছাড়া তোমার কোনো ভাষা ছিল না। তিনি তোমার মায়ের অন্তরে তোমার প্রতি দুর্বিনীত এমন মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, তোমার কান্নায় তোমার মায়ের অন্তরে যেন শেল বিঁধে যেত। তুমি যখন কাঁদতে তখন হাজারও কাজ ফেলে মা দৌড়ে এসে তোমাকে বুকে তুলে নিত। তোমার জন্য তোমার পিতা-মাতার অন্তরে এমন দরদ-ভালবাসা তিনি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তারপর আস্তে আস্তে তোমাকে বড় করে তুলেছেন। এখন বড় হয়ে তুমি বল- *স্রষ্টা বলে কিছু নেই অথবা There is no God!*

তুমি তোমার নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখো কত সুন্দর করে তোমাকে তিনি সৃজন করেছেন। হাত, পা, চোখ, জিহ্বা, ব্রেইন প্রভৃতি অমূল্য অঙ্গে তোমার শরীর গঠন করেছেন যার কোনো মূল্য তুমি পরিশোধ করতে পারবে না। চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি, আকাশ, জমিন, পানি, নদী, সমুদ্র, পাহাড়, গাছপালা, ফসল, উদ্ভিদ, পশু-পাখি প্রভৃতি তোমার সেবায় নিয়োজিত করেছেন যার কোনো খাজনা তোমার পক্ষে

পরিশোধ করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বলেই তিনি এসবের জন্য কোনো ট্যাক্স নির্ধারণ করেন নি। সুতরাং হে মানুষ, কীভাবে তুমি তোমার এমন প্রতিপালকের অবাধ্যতা কর? কিসে তোমাকে তোমার এমন প্রতিপালকের ব্যাপারে বিভ্রান্ত করল?

এই কথাগুলো একটু হৃদয় দিয়ে বিবেক খাটিয়ে ভাবি। আমাদের কি উচিত নয় এমন প্রতিপালকের পরিচয় লাভ করা, তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করা? কিন্তু সন্তুষ্টি আমরা কীভাবে লাভ করতে পারি? নিজের মনমতো নাকি স্রষ্টার ঠিক করে দেওয়া পথে? নিশ্চয় স্রষ্টার ঠিক করে দেওয়া পথে। সুতরাং স্রষ্টার ঠিক করে দেওয়া পথই হবে স্রষ্টার মনোনীত পথ- সত্যের পথ, শান্তির পথ। তাই নয় কি?

সত্যধর্ম ছাড়া শান্তি লাভ অসম্ভব

আলহামদুলিল্লাহ, এই অধম লেখক প্রায় দশ বৎসর যাবত পৃথিবীর নানা ধর্ম নিয়ে নিবিড়ভাবে পড়াশুনা করার চেষ্টা করেছে। এ সময় আমি আমার মুখস্থ করা জন্মগত ধর্মীয় বিশ্বাসকে এজন্য ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করেছি যাতে একজন লেখাপড়া জানা মানুষ হিসেবে আমি আমার লালিত বিশ্বাসকে যাচাই করে নিতে পারি। খুব সম্ভবত সক্রেটিস বলেছিলন, সত্যের চেয়ে বড় বন্ধু নেই। আর আমি এর থেকে বুঝতে চেষ্টা করেছি যে, মহান ও পবিত্র স্রষ্টার চেয়ে বেশি সত্যবাদী কেউ নেই, ফলে তিনিই মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু। তাই অন্তত এতে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না যে, সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যবাদী স্রষ্টা অবশ্যই যেকোনো বিষয়ে মিথ্যার বিপরীতে আমার জন্য সত্যও তৈরি করে রেখেছেন। আমার প্রয়োজন সত্যকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করা। আর সবচেয়ে বড় বন্ধু হিসেবে তিনিই আমাকে সত্যের পথ দেখিয়ে দেবেন।

স্রষ্টার অপার করুণায় অনেকের মতো আমিও স্কুল থেকে শুরু করে দেশি-বিদেশি তিনটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট প্রায় তেইশ বছর প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। এর মধ্যে পিএইচডি করতে গিয়ে নানা বিষয়ে মনের আনন্দে উন্মুক্ত পড়ালেখা করার সুযোগ পেয়েছি, যা এর পূর্বে সিলেবাসবদ্ধ কাঠামোয় আমি

করতে পারি নি। অবশ্য সার্বিকভাবে এতে আমার বিশেষ লাভ হয়েছে যে, প্রথমত আমি ধর্মশাস্ত্রসমূহের বাইরের বিভিন্ন বিষয় যেমন, ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিদ্যা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীতবিদ্যা প্রভৃতি সম্পর্কে পন্ডিতজনের মতো না হলেও অন্তত একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পেরেছি। বাউলতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বাউল, শৈব, শাক্ত, নাথ, বৈষ্ণব, প্রভৃতি নানা তন্ত্র-মন্ত্র বা মতবাদ সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এতে লক্ষ্য করেছি, পৃথিবীর ভাববাদী ও বস্তুবাদী দার্শনিক, কবি-সাহিত্যিকগণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে সমাজের কল্যাণ নিয়ে চিন্তা ও চেষ্টা করেছেন এবং করে যাচ্ছেন। এসব নানা শাস্ত্র, মত ও পথের সকলেরই দাবি হল, তারা সকলেই নিজ নিজ স্থানে বিশুদ্ধ। কিন্তু এ কথা তো সত্য যে, মানুষের মন-মগজ-মস্তিষ্ক প্রসূত হওয়ায় এসব জ্ঞান দোষ-ত্রুটির সীমানা অতিক্রম করতে সর্বদা সক্ষম নয়।

এখন আসি ধর্মশাস্ত্র প্রসঙ্গে। পৃথিবীর সকল ধর্ম সত্য ও সুন্দরের কথা বলে- একথা আমার মুখস্থ ছিল। এখন উপরিউক্ত নানা বিষয় সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা লাভের পর বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে তুলনামূলক অধ্যয়নে মনোযোগী হলাম। নিজের বিশ্বাস যাচাই করতে যেয়ে- 'আমিই ঠিক অন্য সবাই ভুল'- প্রথমেই এমন ধারণা পরিত্যাগ করার চেষ্টা করেছি। তাই মুক্ত মন নিয়ে হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম, খ্রিস্ট, ইহুদি, জৈন, পার্সি, জড়থ্রুস্ট, শিখ প্রভৃতি ধর্ম সম্পর্কে জানতে শুরু করলাম। ধর্মশাস্ত্রসমূহের বাইরের নানা বিষয় সম্পর্কে প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক জানাশোনা (যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করেছি) গড়ে ওঠায় আর এখন নানা ধর্ম নিয়ে অধ্যয়ন করায় আমার বিরাট লাভ হয়েছে যে, এতে নানা বিষয়ের মধ্যে তুলনাপূর্বক একটি মীমাংসায় পৌঁছার সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছি। তা না হলে, ধর্মের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য কী, মনুষ্য রচিত মতবাদের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য কী, সৃষ্টিকর্তার বিধান আর মনুষ্যরচিত বিধানের অবস্থান এবং মানবজীবনে এদের ফলাফল বা পরিণতি কী- এসব আমার পক্ষে হয়তো অনুধাবন করা সম্ভব হত না।

তাই নিজের ধর্মবিশ্বাস যাচাই করতে গিয়ে যখন আমি নানা ধর্ম সম্পর্কে তুলনামূলক অধ্যয়নে মনোযোগী হলাম তখন সকল সুন্দরের মধ্যে পরম সুন্দরটি আমার সম্মুখে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে

ওঠেছে। সাদা আর কালোকে পাশাপাশি রাখলে এদের স্ব-স্ব পরিচয় যেমনভাবে আলাদা আলাদাভাবে ফুটে ওঠে, অগণিত নক্ষত্রের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র যেমন আপন মহিমায় ভাস্বর ঠিক তেমনিভাবে পৃথিবীর নানা পথ ও মতের মধ্যে সর্বাঙ্গসুন্দর শান্তির পথটি সবকিছুকে ছাপিয়ে ওঠে। অনেক সুন্দরের মধ্যে, অনেক সত্যের মধ্যে যা কিছু সর্বোত্তম সেটাই তো পছন্দ করা বুদ্ধিমানের কাজ। বিবেকের দাবিও তো তা-ই। আমি তাই সর্বোত্তম ব্যবস্থাটাই পছন্দ করতে চাইলাম। মহান ও পবিত্র মালিকের অনুগ্রহে তা আমি খুঁজে পেয়েছিও। আমি মনে করি এ নীতি সকলেরই অনুসরণ করা উচিত, অন্তত ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে।

আমরা আধুনিক যুগের মানুষ প্রমাণ ছাড়া কোনো কিছু গ্রহণ করতে রাজি নই। এটি দোষ নয়; বরং গুণ। অতি সাধারণ কোনো বস্তু ক্রয় করার সময়ও আমরা সেটি ভালমতো পরীক্ষা করে নেই যে বস্তুটি খাঁটি কি না। একজন নিরক্ষর মানুষও এ কাজটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে করেন। দশ টাকার মাছ ক্রয়ের সময়ও আমরা সেটি আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে ভালোভাবে পরীক্ষা করে নিই। অথচ পৃথিবীতে অগণিত মানুষ আছেন যারা গোটা জীবনে একবারও এ বস্তু খেয়ে দেখেন নি এবং এতে জীবন অশুদ্ধও হয়নি, কেউ রসাতলেও যাননি। এ প্রাণীকে ভক্ষণ করলেও করা যায় আবার না করলেও চলে। ফলে এটি এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় যা ছাড়া জীবন অর্থহীন হয়ে যায়। অথচ ধর্মবিশ্বাস কি এর চেয়েও তুচ্ছ বা কম গুরুত্বপূর্ণ যে একে নিয়ে ভাবার কোনো-ই প্রয়োজন নেই?

এ প্রসঙ্গে আবারও সক্রেটিসের একটি কথা উল্লেখ করতে চাই। কী অসাধারণ উক্তি তাঁর: "অপরীক্ষিত জীবন যাপন করারই যোগ্য নয়। কর্তব্য-অকর্তব্য, উত্তম-অনুত্তমের আদর্শ খুঁজল না যে মানুষ, ন্যায়-অন্যায়, শুভ-অশুভ, কল্যাণ-অকল্যাণ, শ্রেয়-পরিহার্য স্থির করতে পারল না, তার বেঁচে থাকা তো উদ্ভিদ বা কীট-পতঙ্গের বেঁচে থাকা। এমন জীবন নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মনুষ্যজীবন নয়।" বড় চমৎকার, বড় মূল্যবান কথা।

তাহলে ধর্ম বিশ্বাসের মতো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়কে বিনা প্রমাণে, বিনা পরীক্ষায়, অথবা না বুঝে জীবনভর বয়ে নিয়ে বেড়াব

কোন যুক্তিতে? এভাবে জীবন পার করে দেওয়া মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কারণ কোনো বিষয়ের সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেলে তার প্রতি বিশ্বাস মজবুত হয় ফলে তা পালন করতেও আগ্রহ থাকে। তা না হলে, বিশ্বাস ও আমল হয় কচুপাতার ওপরে পতিত বৃষ্টির পানির ফোঁটার মতো অতি নড়বড়ে যা হালকা বাতাসের আঘাতেই উড়ে যায়। তাই একজন বুদ্ধিমান মানুষের উচিত হবে ধর্মবিশ্বাসকে পরখ করে নেওয়া। কেননা মৃত্যুর পর আমার সৃষ্টিকর্তার কাছে যদি আমার অনুসৃত পথ বা জীবনাদর্শ ভ্রান্ত বলে চিহ্নিত হয়ে যায়, তাহলে ভেবে দেখুন তো তখন আমার কী দশা হবে? তখন কি কেবল এই আফসুসই হবে না যে, হায় আমার পোড়া কপাল, জীবনভর শুধু দুনিয়া দুনিয়া করে কাটালাম, দশ পয়সার অতি তুচ্ছ বস্তুকণাও যাচাই না করে গ্রহণ করিনি। অথচ যে শুদ্ধ ধর্মবিশ্বাস ছাড়া মৃত্যু পরবর্তী অনন্ত জীবনে মুক্তি নাই, যে শুদ্ধ ধর্মবিশ্বাস ছাড়া মৃত্যুর পর অনন্তকাল নরকের আগুনে পুড়তে হবে সেই আসল জিনিসেই আমি ধোঁকা খেয়ে গেলাম! যারা সঠিক পথে ছিল তাদের কথায় কান দেই নি। কিছু বললে বা লেখলে বরং সেসবের বিরুদ্ধে প্রাণপণ বিরোধিতা করেছি। নিজের মতই সঠিক মনে করে অন্ধভাবে বিশ্বাস করেছি, কোনো দিন তা যাচাই করার প্রয়োজন বোধ করিনি। গোঁড়ামির কারণে যুক্তিবুদ্ধির ধার ধারিনি। অথচ, মৃত্যুর পর আজ দেখা যাচ্ছে আমিই মহাভুলে জীবন সাঙ্গ করেছি! এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কিছু কি হবে?

হেদায়েত

হেদায়াতের অর্থ হল মূল মালিক অর্থাৎ, স্রষ্টার নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা যাতে ইহ-পরকাল দুই জগতেই প্রকৃত শান্তি লাভ করা যায়। বিশ্ববিশ্রুত মনীষী আল-গাজালী বলেন, কোনো মানুষ যদি নিজেকে তিনটি প্রশ্ন না করে এবং এর জবাব না খোঁজে তাহলে তার আর ইতর প্রাণীর মধ্যে কোনো তফাত নেই। প্রশ্নগুলো হল: ১. আমি কোথা থেকে এলাম? ২. কী আমার কাজ? এবং ৩. মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমি কোথায় যাব?

কিন্তু মানুষ নিজের বুঝবুদ্ধি দ্বারা এসব প্রশ্নের নির্ভেজাল উত্তর

পেতে পারে কি? কেননা মানুষ যতই জ্ঞানের বড়াই করুক সে একটি সীমাবদ্ধ প্রাণী। সে যা কিছু দেখে, শুনে ও বোঝে তার চেয়ে অধিকাংশই দেখে না, শুনে না ও বোঝে না। মানুষের চোখ তার নিজের সমস্ত শরীরই দেখতে পারে না। মেঘের ওপরে কী আছে দেখতে পারে না, পাহাড়ের ওপাড়ে কী আছে এপাড় থেকে তা দেখতে পারে না, এমনকি একটি সামান্য বৃক্ষ সম্মুখে থাকলে এর ওপাশে কী আছে এপাশ থেকে তা দেখতে পারে না। অর্থাৎ, সৃষ্টিগতভাবেই মানুষ ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে নয়। সে একটি সীমাবদ্ধ প্রাণী।

মানুষের ইন্দ্রিয় ও বিবেকের ক্ষমতা এক জায়গায় শেষ হয়ে যায়। ইন্দ্রিয় ও বিবেকের ক্ষমতার যে সীমারেখা, তার বাইরে এদের কার্যকারিতা থাকে না। যেমন, কাউকে একটি ঘরের দেয়াল দেখিয়ে যদি- (১) দেয়ালের রঙ কী এবং (২) এটি কী দ্বারা তৈরি করা হয়েছে– প্রশ্ন করা হয় তাহলে যথাক্রমে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি খাটিয়ে তা বলে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় যে, দেয়ালটি কীভাবে ব্যবহার করলে এর মালিক খুশি থাকবেন আর কীভাবে ব্যবহার করলে এর মালিক অখুশি থাকবেন? তাহলে ইন্দ্রিয় এর জবাব দিতে অক্ষম। বুদ্ধি বা বিবেক খাটিয়ে একটি অনুমান হয়তো করা চলে, কিন্তু অনুমান অনুমান-ই, অনুমান আর প্রমাণ কখনও সমান নয়। সর্বোপরি অনুমানের ওপর তো আর জীবন চলে না। এমতাবস্থায় এর নির্ভেজাল ও সঠিক উত্তর জানতে হলে স্বয়ং দেয়ালের মালিককেই জিজ্ঞেস করতে হবে। যেকোনো বিবেকবান মানুষ এটাই বলবেন। তাহলে এটা প্রমাণিত হলো যে, মানুষ জ্ঞান লাভ করে তার ইন্দ্রিয় দ্বারা আর ইন্দ্রিয়ের কার্যকারিতা যেহেতু সীমাবদ্ধ তাই মানুষের জ্ঞানও সীমাবদ্ধ।

আবার ইন্দ্রিয় অনেক সময় ভুল জ্ঞানও দেয়। যেমন: এক প্রকার চোখের রোগী বিভিন্ন রঙকে শুধু হলুদ দেখে। অনেক সময় আমাদের চোখে দুরে থাকা রশিকে সাপ বলে মনে হয়। বিজ্ঞান বলে, চোখ সবচেয়ে শক্তিশালী ইন্দ্রিয় অথচ সে এক্ষেত্রে ভুল জ্ঞান দিচ্ছে।

তাহলে জীবন-জগৎ আর সমস্ত বস্তুনিচয় যেকোনো কিছুকে কীভাবে ব্যবহার করলে এসবের মালিক খুশি থাকবেন আর কীভাবে ব্যবহার

করলে অখুশি থাকবেন– এর সর্বাঙ্গীন অভ্রান্ত নির্দেশনা একমাত্র মালিকই দিতে পারেন, মানুষ দিতে পারে না। আর জীবনের পরে কী আছে, কী হবে তার তো কোনো ধারণাই মানুষ নিজে নিজে করতে পারে না।

আবার দেখুন, মানুষ পানাহার করে, জৈবিক চাহিদা মেটায়। এগুলো ইতর প্রাণীও করে। মানুষ যদি এসবকিছুকেই তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য বানিয়ে ফেলে এবং এসবের মধ্যেই দিনরাত পার করে তা হলে ইতর প্রাণীর সঙ্গে তার কী তফাত আছে বলুন? অথচ মানুষকে বলা হয় সৃষ্টির সেরা জীব। আবার, মানুষ যে ঝগড়াঝাটি, মারামারি, খুনখারাবি করে এসব হল হিংস্র পশুর স্বভাব। আর ছলনা, প্রতারণা, শঠতা, ধোঁকাবাজি– এসব হল শয়তানের স্বভাব। মানুষ যদি পশু আর শয়তানের স্বভাবজাত কাজকর্মে লিপ্ত থাকে তাহলেও তার 'সৃষ্টির সেরা'- এই মর্যাদা অর্থহীন হয়ে পড়ে। এজন্য ধর্মগ্রন্থ বলে যে একমাত্র স্রষ্টার অনুমোদিত পন্থায় জীবন অতিবাহিত হলেই সে জীবনকে প্রকৃত মনুষ্যজীবন বলা চলে। এর বিপরীতে মনুষ্যরচিত মতবাদ কিংবা আপন খেয়াল খুশি মতো জীবনযাপন করে আর যাই হোক স্রষ্টার স্বীকৃতি এবং পরকালীন মুক্তি মিলবে না।

অতএব ওপরের আলোচনা দ্বারা সার্বিক বিচারে এটাই প্রমাণিত হল যে, হেদায়াত লাভের জন্য নিজের জীবনাচার স্রষ্টার অনুমোদনসমৃদ্ধ কি না তা যাচাই করা একান্ত প্রয়োজন। অর্থাৎ, হেদায়াত ছাড়া যেহেতু পরকালীন মুক্তি অসম্ভব তাই স্রষ্টার মনোনীত হেদায়াতের বিধি-বিধান সত্যধর্মের মধ্যেই খুঁজতে হবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সত্যধর্মের বৈশিষ্ট্য

আমরা যদি কেবল সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত আমাদের যুক্তিবুদ্ধিকেই কাজে লাগাই তা হলেও একটি সত্যধর্মের কী কী গুণপনা বা বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে তা বের করে ফেলা মোটেও অসম্ভব নয়। সত্যধর্মের ভিত্তি হলেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং প্রথমত, সত্যধর্মের স্বপক্ষে সৃষ্টিকর্তার অবিকৃত নির্দেশনা বা ওহী বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। দ্বিতীয়ত, এই ওহী

যেহেতু সৃষ্টিকর্তার বাণী সুতরাং এটি যেকোনো মানুষের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছালে হবে না। ওহীপ্রাপ্ত ব্যক্তি হবেন প্রথমত, সৃষ্টিকর্তার মনোনীত মনুষ্য ব্যক্তি। তিনি হবেন মানবসমাজের জন্য সৃষ্টিকর্তা মনোনীত একমাত্র মানুষ প্রশিক্ষক। ফলে তাঁর সকল কথা ও কাজ হবে সৃষ্টিকর্তা মনোনীত। তিনি হবেন সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক বিশেষ সাহায্যপ্রাপ্ত এবং যেকোনো প্রকার গুনাহ ও দোষ-ত্রুটি থেকে সুসংরক্ষিত। উল্লেখ্য এমন মহাপুরুষকেই ধর্মীয় পরিভাষায় প্রফেট বা নবী, পয়গাম্বর, রাসূল হিসেবে অভিহিত করা হয়।

ওপরের দু'টি বিষয়ের আরেকটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। লক্ষ্য করুন, ওহী হচ্ছে মানব-জীবন পরিচালনার জন্য সৃষ্টিকর্তার নির্দেশনা বা বিধানাবলি আর প্রফেট বা নবী হচ্ছেন এই বিধানাবলি হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়ার প্রশিক্ষক। এই দুই বিষয় ছাড়া ধর্ম হতে পারে না। ধরুন, শুধু ওহী আছে কিন্তু এর প্রশিক্ষক নেই তাহলে এই ওহী পালনের কী ব্যবস্থা হবে? যেহেতু প্রফেট বা নবী ছাড়া এই ওহী শিক্ষা দেওয়ার সৃষ্টিকর্তা মনোনীত দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই তাই প্রফেট ছাড়া ওহীর শিক্ষা লাভ করা অসম্ভব। প্রফেটের গুণ বা বৈশিষ্ট্যই হলো, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কথা বলেন। এখন সৃষ্টিকর্তার ওহীর শিক্ষা যেহেতু কেবল সৃষ্টিকর্তাই জানেন আর জানেন তাঁর মনোনীত এই প্রফেট সুতরাং প্রফেটের শিক্ষাই হবে সৃষ্টিকর্তার মনোনীত শিক্ষা ফলে ইহ-পরকালে শান্তি লাভের অদ্বিতীয় ব্যবস্থা। দ্বিতীয়ত, প্রফেট আছেন কিন্তু ওহী বা প্রফেটের অবিকৃত শিক্ষামালা নেই তাহলেও হবে না। কারণ সৃষ্টিকর্তার লিখিত বা অলিখিত ওহী ছাড়া প্রফেটের শিক্ষা দেওয়ার কিছুই নেই, ওহীবিহীন শিক্ষার অর্থই হলো এটি সৃষ্টিকর্তা মনোনীত নয়। আর সৃষ্টিকর্তা মনোনীত না হলে সবই মিছে। সুতরাং এটি পরিষ্কার হলো যে, আমাদেরকে শুধু সত্যধর্ম সত্যধর্ম বলে উল্লাস করলেই হবে না, এর জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলি থাকা অপরিহার্য:

১. সত্যধর্মের অবশ্যই অবিকৃত ওহী থাকবে। অর্থাৎ, অবিকৃত ওহী আছে এমন ধর্মই সত্যধর্ম হবে।
২. সত্যধর্মের অবশ্যই একজন প্রফেট বা নবী থাকবেন যাঁর অবিকৃত বাণী বা শিক্ষামালা বর্তমান থাকবে।

সত্যধর্মের খুঁজে

সাধারণত যেকোনো ধর্মের অনুসারী এটা মনে করে থাকেন যে, তিনি ঠিক ধর্মে আছেন; অন্য ধর্মের অনুসারীরা ঠিক পথে নেই, কিংবা সব ধর্মই ঠিক আছে। এক্ষেত্রে আপনি যে দাবি করছেন, আপনার ধর্মই একমাত্র সত্যধর্ম বা সব ধর্মই ঠিক তার অর্থ কী? কারণ, প্রত্যেকের এই একই দাবি কি সত্য হওয়া সম্ভব? প্রত্যেকের দাবিই যদি সত্য হয় তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায়- স্রষ্টাই নানা ধর্ম সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এটা কী করে সম্ভব হতে পারে যে জগতসমূহের একজন মালিক 'এক মানুষ জাতিকে' সৃষ্টি করে তাদেরকে বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত করে ফেললেন? বিশ্ব মানবসংসারে কোনো পরিবারে সন্তানসংখ্যা যতই হোক না কেন বাবা একজনই হয়, এ রীতিই সুবিধাজনক। সন্তানের পিতা একাধিকজন হলে নানা সমস্যা ও বিশৃঙ্খলা যে সৃষ্টি হয় তা স্পষ্ট। আবার, কোনো সন্তানকেই একাধিক মা ধারণ করতে পারেন না, সন্তানের মা একজনই হন– সমস্ত প্রাণীকুলে এই রীতি। কোনো প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট একজনই হন, একাধিকজন হলে মতানৈক্যের ফলে নানা সমস্যা তৈরি হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা ভেঙে গিয়ে প্রতিষ্ঠানই শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায়। এই বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা একাধিকজন হলে অবশ্যই তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি হতো। এক স্রষ্টা বলতেন এখন দিন হবে, আরেকজন বলতেন, রাত। একজন বলতেন, রাত হবে ছয় মাস দীর্ঘ! আরেকজন বলতেন, তিন মাস দীর্ঘ হবে! ফলে একাধিক স্রষ্টার মন কষাকষির যাতাকলে পড়ে গোটা বিশ্বব্যবস্থাটাই তছনছ হয়ে যেত। কাজেই সকল সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা একজন হওয়াই স্বাভাবিক, একাধিকজন হওয়াটাই অস্বাভাবিক। তাহলে এক স্রষ্টার অসংখ্য ধর্ম সৃষ্টি করার কিইবা প্রয়োজন আছে?

নানা মত, নানা পথের ফলে মানুষে মানুষে যে বিভেদ-বৈষম্য বাড়ে বৈ কমে না, তা তো আপনি আমি নিজ চোখেই দেখতে পাচ্ছি। ধর্ম প্রচারের অন্যায় উন্মাদনা পৃথিবীতে অনেক রক্তপাতের কারণ হয়েছে এবং হচ্ছে। সকল ধর্মাবলম্বীর নিজ নিজ দাবি অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তাই যদি সকল ধর্মের স্রষ্টা হন তাহলে এসব দ্বন্দ্ব-কলহ, রক্তপাতের দায় কে নেবে? স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা না মানুষ? কিন্তু সৃষ্টিকর্তার

জন্য এ কী করে মানায় বলুন?

এক পিতার দশ সন্তান হলে পিতা সেই দশ সন্তানকে একইরকম ভালবাসেন যদি না সন্তানরা বড় হয়ে অসৎ আচরণের দ্বারা পিতাকে এক্ষেত্রে বৈষম্য করতে বাধ্য করে। কোনো মায়ের উদর থেকে যদি চারটি সন্তান ভূমিষ্ট হয় তাহলে তাদের পিতা কখনোই এ কথা বলেন না যে, আমি এদেরকে জীবন পরিচালনার জন্য নানা ধরনের পরস্পর বিপরীতমুখী ব্যবস্থা শিক্ষা দিয়ে তাদের মধ্যে বিভেদ-বৈষম্য বাঁধিয়ে রাখব। একজন সাধারণ মানুষের জন্য যদি এটা বেমানান হয় তাহলে এই বিশ্বজাহানের যিনি মালিক তাঁর পক্ষে কী করে মানানসই হবে যে, তিনি এক মানুষজাতিকে বিভিন্ন ধর্মের মাধ্যমে বিভেদ-বৈষম্যের মাঝে ঠেলে দেবেন!

এক ধর্মে যা পালণীয় অন্য ধর্মে তা বর্জনীয়। এক ধর্মে মূর্তিপূজা পালনীয় অন্য ধর্মে একই কাজ বর্জনীয়। এক ধর্মে নামাজ রোজা হজ্জ অবশ্য পালণীয় অন্য ধর্মে একই কাজ বর্জনীয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে নানা ধর্মের নানা বিপরীতধর্মী বিধি-বিধান। তাহলে এক সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীতে মানবকুল নামে একটি জাতিকে স্বয়ং তাঁর প্রতিনিধি করে পাঠালেন, কিন্তু জীবন-বিধান দিলেন একাধিক অধিকন্তু বিপরীতধর্মী হওয়ার ফলে মানবসমাজে নানা দল-উপদল এবং মানুষে-মানুষে বিভেদ-বৈষম্য সৃষ্টি হল– এ কথা কি যৌক্তিক বলে মনে হয়?

কেননা স্রষ্টা বলতে তো এমন এক মহান ও পবিত্র সত্তাকে বুঝায় যিনি সত্তায় একক এবং জ্ঞানে-গুণেও একক। তাই তো তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর সমকক্ষ ও সমতুল্য কিছুই নেই। ফলে তাঁর সকল কর্মকাণ্ড যেকোনো ত্রুটি ও সীমাবদ্ধা থেকে মুক্ত। স্রষ্টার এসব বৈশিষ্ট্য না থাকলে তিনি স্রষ্টা হতে পারেন না। অন্যদিকে, পথ ভিন্ন হলেও গন্তব্য এক কিংবা সকল পথেই মালিককে পাওয়া যায় বা সন্তুষ্ট করা যায়– এ কথারইবা প্রমাণ কী? সৃষ্টিকর্তা যদি নানা পথ ও মতের স্রষ্টা না হন, তিনি একক সুতরাং তাঁর মনোনীত মত-পথ যদি একটিই হয় তাহলে তো অন্যান্য সকল মত-পথ ভ্রান্ত বলেই প্রতিপন্ন হবে। ফলে অন্যান্য ভ্রান্ত মত-পথে তো মালিকের সন্তুষ্টি লাভ করার প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই

একজন স্বল্প শিক্ষিত মানুষও যদি তার যুক্তি-বুদ্ধি ও বিবেককে কাজে লাগান তাহলে তার বিবেক এ কথারই স্বীকৃতি দিবে যে, এমন সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্ট মানবকুল নামের একটি জাতির জন্য একটি ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থাই নির্ধারণ করে থাকবেন– এটাই যৌক্তিক। বিবেকের দাবি কি এটাই নয়?

পদ্ধতি নির্বাচন

এ পর্যন্ত যদি একমত হন, তাহলে আসুন আমরা সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত যুক্তি-বুদ্ধি আর জ্ঞান-প্রজ্ঞা খাটিয়ে সেই একটি সত্যধর্ম তথা জীবন-বিধানকে খুঁজে বের করি। কারণ, আপনার অনুসৃত পথ যদি ভুল হয় তাহলে এই ভুল পথে কি কখনও গন্তব্যে পৌঁছা যাবে? নিশ্চয় না। আপনি যদি আপনার বিবেককে সঠিকভাবে কাজে লাগান তাহলে স্রষ্টা নিশ্চয় আপনার সহায় হবেন। তিনিই আপনাকে এই সঠিক পথ চিনিয়ে দেবেন। আপনাকে এজন্য প্রথমেই এই অনুসন্ধান কর্মের এমন একটি পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে যা হবে সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত। মাটির তলদেশের অজানা সম্পদ আবিষ্কার করতে হলে যেমন সঠিক পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য ঠিক তেমনি সত্যধর্মকে খুঁজে পেতেও আপনাকে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। পদ্ধতি যদি ভুল হয় তাহলে ফলাফল ভুল হতে বাধ্য। ভুল পদ্ধতিতে গোটা জীবন সাধনা করলেও সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না।

সত্যধর্মের সন্ধান লাভ করার জন্য যেসব যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে তা হল: (১) সত্যধর্মের সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ, স্বয়ং স্রষ্টার কাছ থেকে সত্যধর্মের পরিচয় জেনে নেওয়া; (২) সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য মানুষের কাছ থেকে সত্যধর্মের পরিচয় জেনে নেওয়া এবং (৩) বইপত্র পড়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা সত্যধর্মের পরিচয় দিচ্ছেন

এই পদ্ধতি প্রয়োগ করার আগে সৃষ্টিকর্তার সঠিক পরিচয় জানা জরুরি। যিনি সব কিছুর মূল তাঁর সঠিক পরিচয় সম্পর্কে নির্ভেজাল তথ্য না

জানলে আরেকটি মূলে কীভাবে পৌঁছাবেন? কিন্তু মানুষের পক্ষে কি স্রষ্টার সঠিক পরিচয় প্রকাশ করা সম্ভব? সম্ভব নয়। কারণ আমরা তাঁকে দেখিনি, তাঁকে জানি না। তাহলে? তাহলেও মনে রাখুন– অন্তর কখনো মিথ্যা বলে না, মুখে মিথ্যা বের হলেও তা অন্তরের কথা নয়। কাজেই নিজেকে প্রশ্ন করুন যে আমাদের অন্তর কেমন স্রষ্টা কামনা করে।

রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের যদি কোনো দোষ থাকে তাহলে আমরা নিরাশ হই, অখুশি হই। রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পাপী, মন্দচারী, জালিম, অক্ষম বা অপদার্থ হলে আমরা তাঁকে মন থেকে মানি না; ভয়ে হয়তো প্রেসিডেন্ট স্বীকার করি। তাহলে বুঝা গেল, মন সর্বদা সত্য, সুন্দর, শুভ, ভালো পবিত্র, ন্যায়বিচার, করিৎকর্মা, দয়ালু প্রভৃতি গুণকে ভালবাসে ও কামনা করে। তাহলে স্রষ্টা তো সকল গুণে সর্বেসর্বা হবেন, তাই নয় কি? এ থেকেই প্রমাণ হলো যে, মন এমন স্রষ্টাকে কামনা করে যিনি সকল ভালো গুণের সর্বোচ্চ অধিকারী হবেন। গুণে কেউ তাঁর সমকক্ষ ও সমতুল্য হবে না, হওয়া সম্ভব নয়। তিনি যেহেতু স্রষ্টা তাই সকল সৃষ্টির জাগতিক-পরকালীন যেকোনো বিষয়ের নিরঙ্কুশ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের একক ক্ষমতা তাঁর থাকতে হবে। তিনি কারো মুখাপেক্ষী হবেন না কিন্তু সকল সৃষ্টিই তাঁর মুখাপেক্ষী হবে। তাঁর মানুষের মতো জাগতিক-পরকালীন কোনো কিছুর প্রয়োজন হবে না। তাঁর নিজের জন্য খাদ্য, পানীয়, ঘুম, পরিবার এবং বেহেশত, দোযখ, শেষ বিচার ইত্যাদি কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ তিনি কোনো কিছুরই মুখাপেক্ষী নন। অর্থাৎ, সংখ্যায় বা সত্তায় যেমন তিনি একক তেমনি গুণেও তিনি একক। অন্যদিকে তিনি উদ্দেশ্যবিহীন কোনো কিছু করেন না। তাঁর সকল কাজে থাকবে সুগভীর যৌক্তিক কারণ ও রহস্য। চলুন, সর্বপ্রথম এখন এই প্রথম পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা যাক।

সত্যধর্মের যেহেতু অবশ্যই একজন স্রষ্টা আছেন, কাজেই তাঁর কাছ থেকে জেনে নিতে পারলে আর কোনো সমস্যাই থাকে না। কিন্তু স্রষ্টার কাছ থেকে কি সরাসরি জেনে নেওয়া সম্ভব? এটা এক পদ্ধতিতে সম্ভব। তা হল, তিনি যে পদ্ধতিতে সত্যধর্মের সন্ধান দিয়েছেন সে পদ্ধতিতে জেনে নেওয়া। এই পদ্ধতি হল– সৃষ্টিকর্তার কোনো নির্দেশনা থাকলে তা থেকে জেনে নেওয়া।

কেউ যদি তার কোনো প্রতিনিধিকে অন্য কোনো দেশ বা স্থানে কোনো কাজে পাঠায় তাহলে সেই প্রতিনিধি সেখানে গিয়ে কী কী দায়িত্ব পালন করবে সেসব অবশ্যই তাকে বলে দেওয়া হবে। একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে যদি এর বিপরীত হওয়া অর্থাৎ, নির্দেশনা ব্যতীত প্রতিনিধি পাঠানো অবাস্তব হয় তাহলে এই বিশ্বজাহানসমূহ এবং সমুদয় সৃষ্টির যিনি মহান পবিত্র স্রষ্টা, তাঁর পক্ষে কী করে সম্ভব যে, তিনি পৃথিবীতে মানুষকে কোনো নির্দেশনা ছাড়াই ছেড়ে দিয়েছেন? কারণ, আলো-বাতাসে হারিয়ে যাওয়ার জন্য কি জগতসমূহের প্রতিপালক সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন? যে স্রষ্টা খেলাচ্ছলে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কোনো কিছু সৃষ্টি করেন তিনি স্রষ্টা হতে পারেন না। কেননা স্রষ্টার সত্তা ও গুণই এমন যে তিনি নিরর্থক কিছু করেন না। স্রষ্টার সত্তাগত বৈশিষ্ট্য বা গুণই যেহেতু এই, কাজেই কোনো নির্দেশনা ছাড়া তিনি মানুষকে জগতে প্রেরণ করবেন- এটা কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ নির্দেশনাবিহীন জগতে মানুষ প্রেরণ, স্রষ্টার খেলাচ্ছলে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কোনো কিছু সৃষ্টি করাকেই বুঝায়।

সৃষ্টিকর্তার এই নির্দেশনার নাম হল ওহী বা স্রষ্টার বাণী। অর্থাৎ এই ওহী বলতে সৃষ্টিকর্তার নির্দেশনাকে বুঝায় যা যেকোনো প্রকার সীমাবদ্ধতা ও দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত। মানুষের ইহ-পরকালীন সকল বিষয়ের সর্বাঙ্গীন অভ্রান্ত পথনির্দেশ এই ওহী বা বাণী ছাড়া লাভ করা অসম্ভব। সুতরাং ওহী ছাড়া কোনো ধর্ম সত্য হতে পারে না এবং ফলে সেটা অনুসরণযোগ্যও হতে পারে না। কেন নয় তা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার।

এর কারণ হল- মানুষের সত্তাগত সীমাবদ্ধতা। *হেদায়েত-* এই অংশে ইতোপূর্বে মানুষের এই সীমাবদ্ধতার কথা কিছু বলা হয়েছে। তাতে আমরা লক্ষ্য করেছি যে মানুষ যতই জ্ঞানের অধিকারী হোক, সে একটি সীমাবদ্ধ প্রাণী। সে যা কিছু দেখে, শুনে ও বোঝে তার চেয়ে অধিকাংশই দেখে না, শুনে না এবং বোঝে না। মানুষ ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু এই জ্ঞান সব সময় সঠিক হয় না। আর মৃত্যুর পরে কী হবে, বেহেশত-দোযখ কেমন, এতে কী কী আছে অর্থাৎ, মৃত্যুর পরের অনন্ত জগৎ সম্পর্কে তো মানুষ নিজের জ্ঞান খাটিয়ে

কোনোভাবেই কিছু জানতে ও বলতে পারে না। তাহলে ইহকালই হোক আর পরকালই হোক– উভয়লোকেই স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভ একমাত্র তাঁর নির্দেশনা অনুসরণের ওপরই নির্ভর করবে। আর মানব-মস্তিষ্কপ্রসূত জ্ঞান যেহেতু দোষ-ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে নয় তাই মানুষের নিজের তৈরি মতবাদ বা নিয়ম-নীতি অনুসরণের দ্বারা পরম শান্তি ও মুক্তি কোনোভাবেই লাভ করা যাবে না। বলাই বাহুল্য, মানুষের নিজের তৈরি মতবাদ বা নিয়ম-নীতি অনুসরণের অর্থই হল মহামহিম স্রষ্টার নির্দেশনাকে প্রত্যাখ্যান করা। অথচ মানুষের নিজের এবং বিশ্বচরাচরের সবকিছুর মালিক ও দাতা একমাত্র স্রষ্টা আর গুণ ও বৈশিষ্ট্যে একমাত্র তিনিই সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত। কাজেই সৃষ্ট জীবের জন্য এটাই বিবেকের কথা ও নিরাপদ যে সে স্রষ্টার নির্দেশনা বা গ্রন্থ অনুসরণ করে চলবে।

বাস্তবে দেখা যায়, যে যত বেশি জ্ঞান-গুণের অধিকারী হয় অন্যরা তার অনুসরণ করে। এখন নিজের বিবেককেই প্রশ্ন করি– জগতের সকল মানুষের সম্মিলিত জ্ঞান-গুণের চেয়ে এককভাবে কি কেউ জ্ঞান-গুণের অধিকারী আছেন? যদি তেমন কেউ থেকে থাকেন তাহলে তাঁর নির্দেশনা অনুসরণ করা তো অবশ্যই প্রয়োজন। এমন কাউকে যদি পাওয়া যায়, যিনি সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত, যিনি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত সম্পর্কে যাবতীয় নির্ভেজাল জ্ঞান রাখেন, যিনি জীবন দেন মৃত্যুও ঘটান, যিনি সূর্য উদিত করেন, আবার অস্ত করেন, যিনি বিশ্বজাহানের একক স্রষ্টা অথচ তাঁকে কেউ সৃষ্টি করে নি, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, অথচ বাকি সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী তাহলে এই সত্তার নির্দেশনা না মেনে জীবন পার করা নেহায়েত বোকামি ছাড়া কিছু নয়। একমাত্র মহান ও পবিত্র সৃষ্টিকর্তা হলেন এসব গণুের অতুলনীয় একক অধিকারী। কাজেই আমাদের উচিত হবে এমন স্রষ্টার নির্দেশনামতো জীবন পার করা। গোলাম মালিকের কথামতো চলবে নাকি গোলাম তার নিজের কথামতো চলবে? গোলাম মালিকের কথামতো মালিকের বিধানমতো চলবে এটিই নিয়ম।

পৃথিবীতে মানুষের সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা কীভাবে পরিচালিত হবে তার জন্য সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে মানবজগতে এমন প্রধান চারটি ওহী

বা গ্রন্থ বা নির্দেশনানামা প্রেরণ করা হয়েছে। সেগুলো হল: (১) পবিত্র যবুর যা নবী হযরত দাউদ (আ.)- এর মাধ্যমে মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে; (২) পবিত্র তাওরাত যা নবী হযরত মুসা (আ.)- এর মাধ্যমে মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে; (৩) পবিত্র ইঞ্জিল যা নবী হযরত ঈসা (আ.)- এর মাধ্যমে মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং (৪) পবিত্র কুরআন মাজিদ যা নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর মাধ্যমে মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ১০০ খানা ক্ষুদ্র ওহী পুস্তিকার কথা জানা যায় যা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নবীর (আ.) উপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

এখন দেখা যায় তাওরাত, যবুর এবং ইঞ্জিল- এই তিনটি ওহীগ্রন্থকেই এগুলোর অনুসারীরা বিকৃত করে ফেলেছেন। যেকোনো মানুষ মুক্ত মন নিয়ে এগুলো পাঠ করলে এই বিকৃতি তার কাছে ধরা পড়বে। অন্যদিকে অন্য ১০০ খানা ওহীর কোনো হদিস আজ আর পাওয়া যায় না। ফলে তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিলের ওপর নির্ভর করা মোটেও যৌক্তিক নয়। কাজেই আমাদেরকে এক্ষেত্রে এমন কোনো ওহীগ্রন্থ খুঁজে বের করতে হবে যা কোনোরূপ বিকৃত হয়নি। অবিকৃত ওহীগ্রন্থ খুঁজে পেলে তা থেকে জেনে নেওয়াই হবে স্বয়ং স্রষ্টার কাছ থেকে জেনে নেওয়া।

অবিকৃত ওহীগ্রন্থের খুঁজে

সত্যধর্মের অবশ্যই অবিকৃত ওহী থাকতে হবে। কিছুক্ষণ পূর্বেই আমরা ওহীগ্রন্থসমূহের নাম ও পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু ওহী হলেই তা অনুসরণযোগ্য হবে না যতক্ষণ না সেটি অবিকৃত হিসেবে প্রমাণিত হবে। কোনোরূপ যাচাই-বাচাই ছাড়াই হাজার হাজার বছর পূর্বে নাযিলকৃত এসব গ্রন্থকে অনুসরণ করা মোটেই নিরাপদ নয়। কেননা কালের প্রবাহে এগুলোর মধ্যে মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে বিকৃতি ঘটা মোটেও অসম্ভব নয়। কাজেই আপনি যে একটি গ্রন্থকে ওহীগ্রন্থ জ্ঞান করছেন তা কীরূপে বুঝলেন যে- এটি প্রভুর বাণী আর অন্যটি প্রভুর বাণী নয়? তাই এখন আমাদেরকে দেখতে হবে, এগুলো অবিকৃত

অবস্থায় আছে কি না? কারণ অবিকৃত না থাকলে সেটি আমাদের জন্য নির্ভরযোগ্য নয়। এখন এগুলোর সঠিকত্ব যাচাই করবেন কীভাবে? এটি মোটেও কঠিন নয়। স্রষ্টার বাণীকে চিনতে পারার উপায় হল, মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা মহান স্রষ্টা যেহেতু স্বয়ংসম্পূর্ণ, পবিত্র, পরিপূর্ণ ও নির্ভুল ফলে তাঁর বাণীর মধ্যে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হবেই:

(১) সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হতে হবে যে গ্রন্থটি একজন নবী বা প্রফেটের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁর মাধ্যমে লিখিত হয়েছে এবং সেই নবী এটিকে যেভাবে রেখে গেছেন সেভাবে অবিকৃত রয়েছে।

(২) স্রষ্টার বাণীকে পরিপূর্ণ, নির্ভুল ও সঠিক, এমনকি বিন্দুমাত্র ভুলত্রুটি হতেও মুক্ত হতে হবে।

(৩) স্রষ্টার বাণীকে যাবতীয় অসঙ্গতি, অবাস্তব ও অযৌক্তিক বর্ণনা হতে মুক্ত হতে হবে।

(৪) স্রষ্টার বাণীকে গরমিল, বৈসাদৃশ্য ও স্ববিরোধী বক্তব্য হতে মুক্ত হতে হবে।

(৫) স্রষ্টার বাণীকে অনৈতিক, অশালীন ও বিশ্রী গালগল্প ইত্যাদি হতে পবিত্র হতে হবে।

(৬) স্রষ্টার বাণীকে বিকৃতি যথা– সংযোজন-বিয়োজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, অপব্যাখ্যা প্রভৃতি হতে মুক্ত হতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সৃষ্টিকর্তা কোনো ওহী গ্রন্থের বিধান পৃথিবীতে বাস্তবায়িত রাখতে চান ততক্ষণ পর্যন্ত সেটি যেকোনো প্রকার বিকৃতি থেকে সুরক্ষিত থাকতে হবে।

(৭) স্রষ্টার বাণীতে বৈজ্ঞানিক বক্তব্য বা তথ্য থাকলে তা অবশ্যই সত্য প্রমাণিত হতে হবে। হয় তা ইতোমধ্যে সত্য প্রমাণিত হয়েছে নয়তো এমন হবে যে বিজ্ঞান এখনও সে পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে নি।

কোনো ওহীগ্রন্থে যদি উপরিউল্লিখিত যেকোনো একটিও ত্রুটি পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে সেটি মূলেই কোনো ওহীগ্রন্থ নয়, অথবা সেটি স্রষ্টার অবিকৃত ওহীগ্রন্থ বা কালাম নয়, সেটি বিকৃত হয়ে গেছে।

ইহুদি ধর্মগ্রন্থের নাম হলো তাওরাত বা বাইবেল পুরাতন নিয়ম। খ্রিস্ট ধর্মগ্রন্থের নাম হলো ইঞ্জিল বা বাইবেল নতুন নিয়ম। Father De. Vaux, Richard Simon, Jean Astruce প্রমুখ বিখ্যাত

ধর্মযাজক, বিশেষজ্ঞগণ একমত যে, বাইবেলকে বিকৃত করা হয়েছে। তাওরাত ও ইঞ্জিল কীভাবে বিকৃত হয়েছে তার দীর্ঘ বিবরণ দিতে গেলে স্বতন্ত্র পুস্তক লেখার প্রয়োজন। এই বিবরণ বিভিন্ন পণ্ডিত তাদের লিখিত গ্রন্থে ইতোমধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ড. মরিস বুকাইলি রচিত *বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান*, শেখ মুহাম্মদ আব্দুল হাই রচিত *সত্যের সন্ধানে* (ঢাকা : মদিনা পাবলিকেশন্স) গ্রন্থ পড়ে দেখুন। আরও পড়তে পারেন: ১. মুফতি তকি ওসমানী- এর *খ্রিস্টধর্মের স্বরূপ*, ২. শেখ মুহাম্মদ আব্দুল হাই- এর খ্রিস্টান-মুসলিম সংলাপ, অথবা শুধু ৩. ইঞ্জিল শরীফ (বাংলা অনুবাধ), বিবিএস, ১৯৮০ ইত্যাদি গ্রন্থ।

হযরত ঈসা আ.-এর সাহাবী বার্ণাবাসের সুসমাচারে আছে– (১) আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নাই, (২) ঈসা মাসিহ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, তিনি অন্যান্য মানুষের মতো একজন মানুষ (৩) আল্লাহ স্ত্রী-সন্তান থেকে পবিত্র, (৪) ঈসা মাসিহ মরিয়ম পুত্র, তিনি খোদাও নন খোদার পুত্রও নন, তিনি আল্লাহর দাস ও রাসূল, (৫) ঈসা মাসিহ কেবল ইহুদিদের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন, (৬) সেন্ট পৌল বা শৌল নামে ঈসার কোনো সহচর ছিল না, (৭) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ট নবী ইসমাইল বংশে আরবে জন্ম লাভ করবেন যিনি প্রেরিত হবেন গোটা বিশ্বের জন্য, তিনি এসে ধর্মকে পরিপূর্ণ করবেন- তিনি হলেন আহমদ ও মুহাম্মদ, তাঁর ওপর ঈমান আনা ছাড়া পরকালে কোনো মুক্তি নাই, (৮) আমি মুসার শরিয়ত বাতিল করতে আসি নাই প্রতিষ্ঠা করতে এসেছি, কোনো নবী-ই শরীয়ত বাতিল করতে আসেন না কেননা শরীয়ত পালন ব্যতিরেকে আল্লাহকে খুশি করার চিন্তা ভণ্ডামি ছাড়া কিছু নয়, (৯) প্রত্যেককে নিজ নিজ পাপের ফল পরকালে ভোগ করতে হবে একের পাপে অন্য দোষী হবে না ইত্যাদি। (বিস্তারিত জানতে দেখুন: আফজাল চৌধুরী অনূদিত, *বার্ণাবাসের বাইবেল*, ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি।)

হিন্দু, বৌদ্ধ, পার্সি, জৈন, শিখ প্রভৃতি ধর্মের কোনো ওহী বা প্রফেট বা নবী নেই অথবা কোনো অবিকৃত ও সম্পূর্ণ জীবন বিধান নেই। ফলে এসব ধর্ম সম্পর্কে এই গ্রন্থে আলোচনার কোনো সুযোগ নেই।

ইসলাম ধর্ম: পবিত্র কুরআন

এখন অবধারিতভাবে আমরা পবিত্র কুরআনকে পরীক্ষা করতে পারি। এক্ষেত্রে প্রথমেই একটি ব্যতিক্রমী বিষয় হলো, পবিত্র কুরআন নিজেই দাবি করছে যে এটি আল্লাহর বাণী বা ওহী। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: "আমি [মহান ও পবিত্র আল্লাহ্] স্বয়ং এই উপদেশ গ্রন্থ (কুরআন) নাযিল করেছি এবং আমি নিজে [মহান ও পবিত্র আল্লাহ্] এর হেফাজতকারী (হিজর, আয়াত: ৯)।" পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে: "এ সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই।" অর্থাৎ, এটি যে আল্লাহর বাণী তাতে কোনো সন্দেহ নেই, আর সে কারণে এতে কোনো ভুল-ত্রুটিও নেই। (বাকারা, আয়াত: ২) অন্যত্র বলা হয়েছে: "কোনো মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না– সম্মুখ থেকেও নয়, পেছন থেকেও নয়।" (হা-মীম সিজদাহ, আয়াত: ৪২।) আল-কুরআন আজ থেকে প্রায় পনের শত বৎসর আগে নাজিল হয়। দেখা যায়, মানুষের জীবনে যা কিছু প্রয়োজন- ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক, এবং সেটি কেয়ামত পর্যন্ত, তার সবকিছুর মূলনীতি এতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানের এমন অনেক বিষয়ের উল্লেখ কুরআনে রয়েছে যা একশ বছর আগেও মানুষ কল্পনা করতে পারত না। একশ বছর আগেও এসমস্ত বিষয় সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ছিল সব ভুল ও ধাঁধায় ভরপুর। আর অনেক বিষয়ে মানুষের কোনো জ্ঞানই ছিল না। কুরআনে বর্ণিত অনেক বিষয় আদৌ সে যুগের আলোচিত বিষয় ছিল না বরং সেসব সত্য হয়ে ধরা পড়েছে কয়েক শতাব্দী পরে এসে। তাহলে দেড় হাজার বছর পূর্বে কোনো মানুষ এসবের নির্ভুল ধারণা কীভাবে দিতে পারে? একমাত্র ওহী না হলে এ সম্ভব নয়। এজন্যই কুরআনের শুরুতেই বলে দেওয়া হয়েছে: "এ সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই (এটি যে ওহী তাতে কোনো সন্দেহ নেই, আর সে কারণে এতে কোনো ভুল-ত্রুটিও নেই।" বাকারা, আয়াত: ২)

হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিরক্ষর ছিলেন, তিনি দুনিয়াবী কোনো প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম লেখাপড়াও শেখেন নি।

একজন বিজ্ঞানীর পক্ষেও যেখানে এক/দু'শ বছর আগেও এসমস্ত বিষয় সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব ছিল না সেখানে একজন মরুদেশের মানুষের পক্ষে তাও নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও কী করে দেড় হাজার বছর পূর্বে এমন বৈজ্ঞানিক সত্য কথা বলে দেওয়া সম্ভব হয়! কাজেই ওহী ছাড়া এমনটি সম্ভব হতে পারে না। কুরআন মানুষকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলছে, তারপরও এতে যদি কারো সন্দেহ থাকে তাহলে সে যেন কুরআনের কোনো সূরার মতো একটি সূরা, অন্তত এর ছোট্ট একটি সূরার মতো একটি সূরা রচনা করে দেখায়। কুরআনই এর জবাব দিয়ে বলছে– এ কষ্মিনকালেও সম্ভব নয়। যেমন: "এ (কুরআন) সম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে, যা আমি আমার বান্দার (হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মতো একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আসো। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকেও সঙ্গে নাও– এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। আর যদি তা না পার– অবশ্য তোমরা তা কখনও পারবে না—তাহলে সেই দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করো, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। তা প্রস্তুত করা হয়েছে অবিশ্বাসীদের জন্য।" (বাকারা, আয়াত: ২৩-২৪) আমরা দেখছি, প্রায় পনেরশত বৎসর পূর্বে কুরআন এই চ্যালেঞ্জ করেছে এবং পৃথিবীতে অসংখ্য পণ্ডিত থাকলেও আজ পর্যন্ত কেউ এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারেন নি।

কুরআনে এমন অনেক বৈজ্ঞানিক বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে যা একশ বছর আগেও মানুষ কল্পনা করতে পারত না। কুরআনে রয়েছে জীববিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র প্রভৃতি সম্পর্কীয় আলোচনা। মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির পর্যায় তথা ভ্রূণতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, পানিতত্ত্ব, সৌরজগত, গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তন, উদ্ভিদ ও কীটপতঙ্গ, আকাশের স্তর ও মহাশূন্য, মহাবিশ্বের সৃষ্টি (big-bang) ও এর ক্রমসম্প্রসারণশীলতা, সময় ও দিন-রাত্রির আবর্তন প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নির্ভুল বৈজ্ঞানিক আলোচনা রয়েছে কুরআনে। এখানে নমুনাস্বরূপ কয়েকটি প্রসঙ্গ সংক্ষিপ্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করা হলো।

নমুনা- ১ঃ পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্যের আবর্তন নিয়ে পঞ্চাশ বছর আগেও বিজ্ঞানীরা আমাদেরকে ভুল তথ্য দিয়েছিলেন। কেউ বলেছিলেন, এগুলো আবর্তন করে; কেউ বলেছিলেন, এসব স্থির। কিন্তু প্রায় পনেরশত বৎসর পূর্বে কুরআন বলেছে যে, সূর্য, চন্দ্র এসব আপন আপন অক্ষে আবর্তনশীল এবং বিজ্ঞান আজ এ সত্য স্বীকার করে নিয়েছে। কুরআন বলছেঃ

"সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে, এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ। চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন কক্ষপথ নির্ধারিত করেছি অবশেষে সে পুরাতন খর্জুর শাখার অনুরূপ হয়ে যায়। সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রি অগ্রে চলে না দিনের; প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে আবর্তন করে।" (ইয়াসিনঃ ৩৮-৪০) "সূর্য ও চন্দ্র নির্ধারিত কক্ষপথে আবর্তন করে।" (আর-রহমানঃ ৫)

শুধু তাই নয়, সূর্য ও চন্দ্র একই প্রকৃতির নয়, সূর্য নিজেই আলোর আঁধার, কিন্তু চন্দ্র সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়। বিস্ময়ের ব্যাপার যে, আল-কুরআনে চন্দ্র-সূর্যের জন্য এক শব্দ ব্যবহৃত হয়নি, সূর্যকে বলা হয়েছে 'প্রদীপ' যার নিজের আলো আছে আর চন্দ্রকে বলা হয়েছে 'আলো' যা ধার করা। চন্দ্র-সূর্যের এই ভিন্ন প্রকৃতি না হলে উভয়কেই একই শব্দে উল্লেখ করার কথা ছিল। কুরআন বলছেঃ

"তোমরা কি লক্ষ কর না যে, আল্লাহ কীভাবে আকাশকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানে চন্দ্রকে রেখেছেন আলোরূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে।" (নূহঃ ১৫-১৬)

একই ধরনের বক্তব্য কুরআনের আরো আয়াতেও রয়েছে যেখানে সূর্যকে প্রদীপ বা সিরাজ এবং চন্দ্রকে আলো বা ক্বামার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো মানুষের পক্ষে সেকালে, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় পনেরশত বছর পূর্বে এরকম চন্দ্র-সূর্যের প্রকৃতি জানা ও সেমতে পার্থক্য করে শব্দ চয়ন করার প্রশ্নই ওঠে না।

নমুনা- ২ঃ শেক্সপিয়ার (১৫৬৪-১৬১৬) তাঁর *Henry The Fourth* নাটকে মৌমাছির প্রসঙ্গে দেখিয়েছেন, পুরুষ মৌমাছিদের

একজন রাজা থাকে যা পুরুষ মৌমাছিদের ভিতর থেকেই নির্ধারিত হয়। রাজা মৌমাছি ছাড়া অন্যান্য মৌমাছিরা হল সৈনিক মৌমাছি যাদের কাজ হল মৌছাক নির্মাণ, মধু সংগ্রহ থেকে সব। রাজার নির্দেশ মতো সৈনিক মৌমাছি সকল কাজ সম্পাদন করে। শেক্সপিয়ারের আমলে এবং ১৯৭৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত মানুষের স্রেফ ধারণা ছিল যে, মৌমাছি দুই প্রকার, পুরুষ ও স্ত্রী; স্ত্রী মৌমাছি কেবল সন্তান জন্ম দেয়, আর বাদবাকি সব কাজ করে পুরুষ মৌমাছিরা। ১৯৭৩ সালে অস্ট্রিয়ার বিজ্ঞানী Karl Von Frisch মৌমাছির জীবনচক্র নিয়ে এক বিস্ময়কর গবেষণা ফলাফল প্রকাশ করেন। এই গবেষণা মৌমাছি সম্পর্কে পূর্বের সব ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ করে। বিজ্ঞানী ফটোগ্রাফি ও অন্যান্য আধুনিক পদ্ধতিতে দেখালেন যে, লিঙ্গভেদে মৌমাছি পুরুষ ও স্ত্রী এই দুই প্রকার হলেও কর্মের ভিত্তিতে মৌমাছি তিন প্রকারের। পুরুষ মৌমাছি, স্ত্রী মৌমাছি এবং বন্ধ্যা স্ত্রী মৌমাছি। স্ত্রী মৌমাছিদের বলা হয় রাণী মৌমাছি বা Queen bee।

Karl Von প্রমাণ করেন, এই রাণী মৌমাছিদের প্রজনন তথা সন্তান উৎপাদনে অংশগ্রহণ ছাড়া পুরুষ মৌমাছিদের আর কোনো কাজ নেই। মৌচাক নির্মাণ, মধু সংগ্রহ থেকে নিয়ে আর সব কাজ করে বন্ধ্যা স্ত্রী মৌমাছিরা যারা প্রকৃতিগতভাবে সন্তান জন্মদানে অক্ষম। Karl Von এদের নাম দিয়েছেন working bee বা কর্মী মৌমাছি। সুতরাং রাণী ও বন্ধ্যা মৌমাছি উভয়েই স্ত্রী মৌমাছি, পার্থক্য কেবল একটাই যে, একটি সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম এবং শুধু এই কাজটিই করে অন্যটি অক্ষম এবং এ ছাড়া বাদবাকি সক কাজ করে থাকে। Karl Von দেখান কর্মী মৌমাছিরা ফুল থেকে রস সংগ্রহ করে যখন বের হয়, তখন অদ্ভুত এক কাজ করে। তা হল কর্মী মৌমাছি যে গাছ বা উদ্যান থেকে ফুলের রস সংগ্রহ করেছে, অন্য কর্মী মৌমাছিকে সে ঐ স্থানের খবর ও পৌঁছার রাস্তাটি হুবহু বাতলে দেয়, অন্যান্য মৌমাছিরা সে পথেই ফুলের রস সংগ্রহে ঐ স্থানে গমন করে। এই কাজের জন্য Karl Von কে ১৯৭৩ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। আশ্চর্যের বিষয় হল ১৯৭৩ সালে যে জিনিসটি আবিষ্কৃত হল সেটিই প্রায় পনেরশত বছর পূর্বে কুরআন বলে রেখেছে। কুরআন

বলছে: "আপনার পালনকর্তা মৌমাছিকে আদেশ দিলেন, পর্বতগাহে, বৃক্ষে এবং উঁচু চালে গৃহ তৈরি করো। এরপর সর্বপ্রকার ফল থেকে ভক্ষণ করো এবং আপন পালনকর্তার সরল পথসমূহে চলমান হও।" (নাহল: ৬৮-৬৯)

এখানে গৃহ তৈরি, খাওয়া ও পালনকর্তার উন্মুক্ত পথসমূহে চলা- এই তিনটি নির্দেশ একই সঙ্গে একই প্রকৃতির মৌমাছিকে দেওয়া হয়েছে। আরবিতে নির্দেশবাচক তিনটি ক্রিয়াপদ হল, ইত্তাখিজি, কুলি এবং উসলুকি। আরবি ভাষারীতি অনুসারে এই তিনটি ক্রিয়াপদ স্ত্রীবাচক শব্দ, এগুলোর পুরুষবাচক হবে- ইত্তাখিজ, কুল ও উসলুক। অর্থাৎ, ঘর বানানো, যারা ঘর বানাচ্ছে তাদের খাবার সংগ্রহ, মধু সংগ্রহে সরল পথে চলার কাজে স্ত্রী মৌমাছিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পুরুষকে নয়। অর্থাৎ, কুরআন মতে, ঘর বানানো, ফুলের রস সংগ্রহ এসব স্ত্রী মৌমাছি করছে। অন্যদিকে এক কর্মী মৌমাছি অন্য কর্মী মৌমাছিকে যে পথ বাতলে দেয় সেটাই তাদের জন্য সরল পথ, যে পথে চলতে আল্লাহ তাদেরকে আদেশ করেছেন। সুতরাং দেখা যায়, বিজ্ঞানী Karl Von- এর গবেষণা সেটাই প্রমাণ করেছে, যা আল-কুরআন প্রায় পনেরশত বছর পূর্বেই বলে রেখেছে।

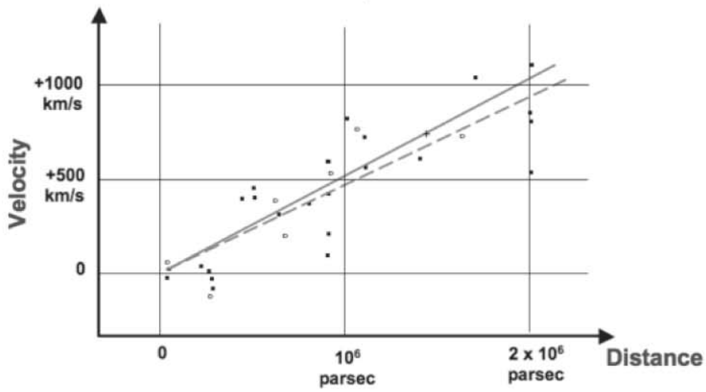
নমুনা- ৩: আইনস্টাইনের (১৮৭৯-১৯৫৫) *Theory of Relativity* তথা *Time, Space-* এর সূত্র ধরে রাশিয়ান পদার্থবিজ্ঞানী Alexander Friedmann, Georges Lemaitre দাবি করেছিলেন যে এই মহাবিশ্ব স্থির নয় বরং ক্রমবর্ধমানশীল। Friedmann ১৯২২ সালে আবিষ্কার করেন যে, আইনস্টাইনের স্থির-মহাবিশ্ব তত্ত্বে একটি ভুল রয়েছে, এটি হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় শূন্য দ্বারা বিভক্তিকরণ। আইনস্টাইনের সমীকরণের সম্ভাব্য সমাধান হিসেবে তিনি দু'টি অস্থিতিশীল (non-static) মডেল প্রণয়ন করেন। এর একটি হচ্ছে কালের সাথে নিখিল বিশ্বের সম্প্রসারণ ঘটছে এবং অন্যটিতে সংকোচন হচ্ছে। Friedman- এর পর Lemaitre আরো অগ্রসর হয়ে দাবি করেন যে, মহাবিশ্ব একটি ক্ষুদ্র কণিক অবস্থা থেকে বিস্ফোরণের মাধ্যমে (big bang) সৃষ্টি হয়েছে এবং এটি ক্রমাগত সম্প্রসারণশীল। এদের কারোর কথাই তখন তেমন কেউ একটা পাত্তা

দেয়নি, এমনকি স্বয়ং আইনস্টাইন পর্যন্ত এদের দাবি অস্বীকার করে বলেছিলেন, মহাবিশ্ব ক্রমবর্ধমান নয় বরং স্থির। অথচ, আইনস্টাইনের তত্ত্বের সূত্র ধরেই এরা এসব কথা বলেছিলেন।

এরপর আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী Edwin Hubble আধুনিক টেলিস্কোপ কাজে লাগিয়ে ১৯২৯ সালে প্রমাণ করেন যে, আমাদের মহাবিশ্বের ছায়াপথগুলো ক্রমাগত পরস্পর দূরে সরে যাচ্ছে। এতে তিনি Doppler Effect তত্ত্ব ব্যবহার করেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্বের বস্তুসমূহের তরঙ্গদৈর্ঘ্য যদি আলোকতরঙ্গের উপর ফেলা হয় তাহলে তরঙ্গ যদি লাল আলোর দিকে সরে আসে তাহলে বুঝতে হবে ছায়াপথগুলো পরস্পর দূরে সরে যাচ্ছে। যদি নীল আলোর দিকে সরে যায় তাহলে বুঝতে হবে ছায়াপথগুলো পরস্পর দূরে সরে যাচ্ছে না, বরং কাছে চলে আসছে। বারবার এই পরীক্ষা করে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ছায়াপথগুলো পরস্পর দূরে সরে যাচ্ছে। তা ছাড়া ছায়াপথের দূরত্ব ও এর পিছনে সরে যাওয়ার বেগের মধ্যে একটি রেখাগত (linear) সম্পর্ক আছে। একটি ছায়াপথের এই সরে যাওয়ার প্রেক্ষিতে এর দূরত্ব বৃদ্ধি পায় (চিত্র- ১ দেখুন)। এটিকে হাবলের নিয়ম বা Hubble's Law বলা হয়। বিখ্যাত Mount Wilson Astro-laboratory- তে হাবল পরীক্ষাকালে Doppler Effect তত্ত্ব ব্যবহার করে ছায়াপুঞ্জের red-shift প্রত্যক্ষ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। আইনস্টাইন পরে স্বীকার করেন যে, বিজ্ঞানীদের বক্তব্য সঠিক অর্থাৎ, মহাবিশ্ব নিয়ত সম্প্রসারিত হচ্ছে।

এখন বিজ্ঞানজগতে এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, মহাবিশ্ব প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত হচ্ছে, অর্থাৎ মহাবিশ্ব সর্বদা ক্রমসম্প্রসারণশীল। মহাবিশ্বের এই নিয়ত সম্প্রসারণশীলতা বিজ্ঞানীগণ ১৯২৯ সালে আবিষ্কার করেছেন বা জানতে পেরেছেন, অথচ এই মহা জটিল বিষয়টিই প্রায় পনেরশত বছর পূর্বে কুরআন বলে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, যে মহা-বিস্ফোরণ তথা big-bang- এর মাধ্যমে এই সম্প্রসারণ শুরু হলো তার কথাও মানুষ বা বিজ্ঞানীরা এর পূর্বে জানতেন না। এ কথাও কুরআন পনেরশত বছর পূর্বে বলে দিয়েছে। এবার শুনুন সে কথা। আল-কুরআন বলছে: "আমি নিজ ক্ষমতাবলে আকাশ সৃষ্টি

করেছি এবং নিশ্চয়ই একে সম্প্রসারিত করে চলেছি।" (জারিয়াত: ৪৭) অবিশ্বাসীরা কি লক্ষ করে না যে, আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবী পরস্পর সংযুক্ত ছিল, পরে আমরা[১] উহাদের পৃথক করে দিয়েছি...।



চিত্র: ১: হাবল আইন [Hubble's Law]

নমুনা- ৪: বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর উপরিভাগের বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন স্তরের বিষয়টি আবিষ্কার করেন। এই স্তরগুলো হল: ট্রপোস্ফিয়ার, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার, মেসোস্ফিয়ার, থার্মোস্ফিয়ার, এক্সোস্ফিয়ার। বিজ্ঞানী Sir Venn Allen প্রমাণ করেছেন যে পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের চারদিকে একটি শক্তিশালী Magnetic Field আছে যা পৃথিবীপৃষ্ঠের চারদিকে একটি বলয় সৃষ্টি করে রেখেছে। বিজ্ঞানীর নামে এর নামকরণ করা হয়েছে Venn Allen Radiation Belt। এই বেল্ট আমাদের বায়ুমণ্ডলকে চারদিকে ঘিরে রেখেছে। বায়ুমণ্ডলের দ্বিতীয় স্তরের নাম হল স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার যার আছে বিস্ময়কর এক উপস্তর যা আজ ওজোন স্তর নামে সুপরিচিত। সূর্যে প্রতি সেকেন্ডে যে বিস্ফোরণ ঘটে তার তেজস্ক্রিয়তা হিরোশিমা-নাগাসাকিতে ফেলা দশ হাজার বিলিয়ন এটম বোমার সমান। অন্যদিকে মহাকাশে মারাত্মক তেজস্ক্রিয় উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হয় যার আঘাতে পৃথিবী লণ্ডভণ্ড হয়ে যেত। অন্যদিকে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে প্রবেশ করলে

[১] আরবি ভাষারীতি অনুসারে 'আমরা' সম্মানার্থে একবচনরূপে ব্যবহৃত হয়।

পৃথিবীতে কোনো প্রাণীই বেঁচে থাকতে পারত না।

আবার পৃথিবীতে নিষিক্ত সব কার্বনডাই-অক্সাইড মহাকাশে চলে গেলেও পৃথিবী বাস-অনুপযোগী ঠান্ডা হয়ে যেত। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এসব বিপদের হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে। এক্ষেত্রে বায়ুমণ্ডলের যে স্তরটি ছাদের ন্যায় এই সুরক্ষার কাজ করে যাচ্ছে তার নামই ওজোন-স্তর। অর্থাৎ, ওজোন-স্তর সূর্যের উপকারী তথা প্রয়োজনীয় তাপ বা রশ্মি, বেতার তরঙ্গ প্রভৃতি, এক কথায় প্রয়োজনীয় ও উপকারী বস্তু পৃথিবীতে প্রবেশ করতে দেয়, কিন্তু ক্ষতিকর বস্তুর প্রবেশ ঠেকিয়ে দেয়। অন্যদিকে পৃথিবীর ক্ষতিকর বস্তু যেমন অতিরিক্ত কার্বনডাই-অক্সাইড মহাকাশে নিক্ষিপ্ত করে দেয়, কিন্তু প্রয়োজনীয় কার্বনডাই-অক্সাইড ভূ-পৃষ্ঠে ধরে রাখে। বাড়ির ছাদ যেমন অধিবাসীকে অধিক তাপ, বৃষ্টি, কোনো দুর্যোগ প্রভৃতি থেকে রক্ষা করে, ঠিক তেমনি বায়ুমণ্ডলের এই ওজোন-স্তর পৃথিবী ও তার অধিবাসীদেরকে উপরিউল্লিখিত নানা বিপদ ও ক্ষতি থেকে ছাদের মতো রক্ষা করে চলেছে।

পরম আশ্চর্যের বিষয় যে, কেবল আধুনিককালের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আমরা এই মহাসত্যটি আজ জানতে পেরেছি, অথচ প্রায় পনেরশত বছর পূর্বে কুরআন বলছে:

"আমি আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ, অথচ তারা আমার আকাশস্থ নিদর্শনাবলি থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।"

কুরআনের বৈজ্ঞানিক সত্যতা নিয়ে এরকম আলোচনা করতে হলে পৃথক মহা-গ্রন্থের প্রয়োজন। এখানে শুধু নমুনাস্বরূপ আরো কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হলো:

অর্থাৎ, "হে জিন ও মানবকুল, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে অতিক্রম কর, কিন্তু বিশেষ শক্তি ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না।" (আর-রহমান: ৩৩)

এখানে লক্ষ্য করুন, যদি শব্দের জন্য আরবিতে *ইন*, *লাও*- দুটিই

ব্যবহার করা যায়। *ইন* তখনই ব্যবহৃত হয় যখন সে কাজটি আয়ত্তযোগ্য হয়। পক্ষান্তরে কাজটি করা অসাধ্য হলে *লাও* ব্যবহৃত হয়। এই আয়াতে যদি'র জন্য আরবি *ইন* শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, মানে ভবিষ্যতে এসব কাজ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আজ মানুষ মহাকাশে ভ্রমণ করছে, চাঁদে, মঙ্গলে বিচরণ করছে- এমন ঘটনা যে ভবিষ্যতে ঘটবে তা প্রায় পনেরশত বছর পূর্বে কোনো মানুষের পক্ষে কল্পনা করার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

কুরআনে দিন-রাত্রির আবর্তন বিষয়ে বলা হয়েছে: তিনি কুণ্ডলির মতো জড়িয়ে দেন রাত্রিকে দিনের উপর এবং দিনকে রাত্রির উপর। তোমরা কি লক্ষ কর না আল্লাহ কীভাবে রাত্রিকে দিনের মধ্যে মিলিয়ে দেন এবং দিনকে রাত্রির মধ্যে। দিন-রাত্রির পরিক্রমণের বেলায় বাস্তবে মহাশূন্যে কী ঘটে থাকে? হাল আমলে মার্কিন নভোচারিরা মহাশূন্য থেকে এটি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তার চিত্রও তুলে রেখেছেন। তাতে দেখা যায়, পৃথিবীর আবর্তনের ফলে সূর্যের আলোয় পৃথিবীর সম্মুখ অংশ ও বিপরীত অংশের দিন-রাতের ধারাবাহিক পরিবর্তন হচ্ছে, ঘুরে ঘুরে দিন আর রাত হচ্ছে- দিন-রাত্রির দুই এলাকা একই সময়ে একই আবর্তনে ঘুরপাক খাচ্ছে। দিন-রাত্রির এই যে অবিরত আবর্তন, সেই বিষয়টিকেই আল-কুরআন উপরিউল্লিখিত ভাষায় প্রকাশ করেছে। পনেরশত বছর পূর্বে কোনো মানুষের পক্ষে এসব কথা বলা অসম্ভব। আল-কুরআনুল কারীমে আরো বলা হয়েছে:

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে কার্পেটের মতো বানিয়েছেন যাতে তোমরা চলাফেরা করতে পার। (নূহ: ১৯-২০) পৃথিবীকে আমরা বিস্তৃত করেছি, কতই না উত্তমভাবে আমরা তাহা করেছি। (যারিয়াত: ৪৮) তিনিই দুই সমুদ্রকে মিলিয়ে দিয়েছেন, একটি মিষ্ট, তৃষ্ণা নিবারক ও একটি লোনা, বিস্বাদ। তিনি দুই দরিয়ার মাঝখানে রেখেছেন একটি অন্তরায়- যা লঙ্ঘন নিষিদ্ধ। (ফুরকান: ৫৩) আমি কি জমিনকে বিস্তৃত ও পর্বতমালাকে খুঁটি করি নি? (নাবা: ৬-৭) তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে [ভূতত্ত্ববিজ্ঞান অনুযায়ী পর্বতমালা খুঁটির মতো

জমিনকে নিঃসন্দেহে স্থিরতা দিয়েছে।]। (লুকমান: ১০) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, অতঃপর তাকে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। অতঃপর তুমি দেখ যে, তার মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। তিনি আকাশস্থিত শিলাস্তূপ থেকে শিলাবর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা, তা অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। তার বিদ্যুৎঝলক দৃষ্টিশক্তি যেন বিলীন করে দিতে চায়। (নূর: ৪৩) প্রাণবন্ত সবকিছুকে আমরা পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। (আম্বিয়া: ৩০) [তিনিই] আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষাণ এবং এর দ্বারা আমরা জোড়ায় জোড়ায় উদ্ভিদ জন্মাই- একটি আরেকটি থেকে আলাদা। (ত্বোয়াহা: ৫৩) পৃথিবীতে আমরা সকল প্রকার সামগ্রী সৃষ্টি করেছি পুরোপুরি ভারসাম্য রক্ষা করে। (হিজর: ২০)

নিশ্চয়ই গবাদিপশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তোমাদিগকে পানের জন্য দিয়েছি- যা তাদের দেহের অভ্যন্তরে- অন্ত্রের বস্তুনিচয় ও রক্তের সংযোগের ফলে দুগ্ধ হিসেবে আসে- যে পান করে তা তার জন্য খাঁটি ও উপকারী (দুগ্ধবিজ্ঞান অনুযায়ী পশুর দেহের অভ্যন্তরে দুধ প্রস্তুতের জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়া কুরআনের বর্ণনার অনুরূপ।)। (নহল: ৬৬) আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন সামান্যতম শুক্রবিন্দু হতে। (নাহল: ৪) আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে এক সংরক্ষিত আঁধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়। (মুমিনুন: ১২-১৪)

পবিত্র কুরআন কি অবিকৃত আছে?

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: “আমি [মহান ও পবিত্র আল্লাহ্] স্বয়ং এই উপদেশ গ্রন্থ (কুরআন) নাযিল করেছি এবং আমি নিজে [মহান ও

পবিত্র আল্লাহ্] এর হেফাজতকারী (সূরাঃ হিজর, আয়াতঃ ৯)।" অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "কোনো মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না– সম্মুখ থেকেও নয়, পেছন থেকেও নয়।" (সুরাঃ ৪১:৪২।) দেখা যায়, তাওরাত, যবুর ও বাইবেলে একথা কোথাও বলা হয়নি যে, এগুলো আমি আল্লাহর বাণী হলেও [বিকৃত হওয়ার আগে মূল বাণী।] এসব সর্বদা অবিকৃত থাকবে। কিন্তু কুরআনে স্বয়ং এর নাযিলকারী অর্থাৎ, আল্লাহ্ নিজে বিকৃত হওয়া থেকে এর হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করে বলছেন যে- আমি নিজে এর হেফাজতকারী ফলে কোনো মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না– সম্মুখ থেকেও নয়, পেছন থেকেও নয়। এর কারণ কী?

এর কারণ হলো- অন্যান্য ওহী গ্রন্থসমূহ সেটা ক্ষুদ্র বা বড় হোক, সেগুলো প্রেরিত হয়েছিল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। সেই নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সময়ের প্রয়োজনে নির্দেশনার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন জরুরি ছিল। ফলে সেটি রদ করে দ্বিতীয় আরেকটি ওহীগ্রন্থ প্রেরণ করা হত। এ ধারা পবিত্র ইঞ্জিল পর্যন্ত বহাল থাকে। কিন্তু মহাবিশ্ব ও এর সমুদয় সবকিছুর যেহেতু শেষ পরিণতি বা বিনাশ আছে কাজেই এই ধারা অনন্তকাল পর্যন্ত বহাল থাকার সুযোগ নেই। অর্থাৎ, একটি পর্যায়ে গিয়ে ওহী ও নবী প্রেরণের ধারা বন্ধ করতেই হবে। তাই দেখা যায়, পবিত্র কুরআন এবং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর পর আর কোনো ওহীগ্রন্থ আসেনি এবং আর কোনো নবীও আসেন নি– এর আর কোনো সুযোগ নেই।

যেহেতু এই ধারা এক পর্যায়ে শেষ করতে হবে তাই মহান স্রষ্টা পবিত্র কুরআন এবং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর মাধ্যমে এই ধারার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে দিয়েছেন। এখন কেয়ামত পর্যন্ত সর্বশেষ এই পবিত্র কুরআন মাজিদ এবং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর নির্দেশনাই বলবৎ থাকবে। কাজেই এটি স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পূর্ববর্তী ওহীগ্রন্থসমূহ যেহেতু একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছিল এবং সময়ের প্রয়োজনে আরেকটি ওহীগ্রন্থ যেহেতু পূর্ববর্তীর স্থান দখল করেছে তাই স্রষ্টার পূর্ববর্তী গ্রন্থকে

সংরক্ষণ করার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। অর্থাৎ, বাইবেল পর্যন্ত কোনো ওহীগ্রন্থেরই সংরক্ষণ প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু পবিত্র কুরআন সম্পর্কে এ কথা খাটে না। কারণ, কুরআন যেহেতু কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে কাজেই এটিকে সংরক্ষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। সৃষ্টিকর্তা তা-ই করলেন অর্থাৎ, স্বয়ং তিনি নিজেই এর সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সৃষ্টিকর্তা যেহেতু জানেন যে, মানুষের পক্ষে এই সংরক্ষণের কাজ অসম্ভব [যেমন তাওরাত, যবুর, বাইবেল প্রভৃতির সংরক্ষণ মানুষ করতে পারে নি, বিকৃত করেছে।] তাই তিনি নানা কৌশলে এই সংরক্ষণের কাজ করে যাচ্ছেন।

এখানে সংরক্ষণ বলতে এর শব্দে ও মর্মে যেকোনো প্রকার সংযোজন, বিয়োজন তথা বিকৃতি থেকে হেফাজতকে নির্দেশ করে। যেমনটি এই গ্রন্থেই বলা হয়েছে যে, “আমি স্বয়ং এই উপদেশ গ্রন্থ (কুরআন) নাযিল করেছি এবং আমি নিজে এর হেফাজতকারী (সূরা: হিজর, আয়াত: ৯)।” লক্ষ্য করুন, বিশ্বে লক্ষ লক্ষ হাফেজে-কুরআন রয়েছেন যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই মহাগ্রন্থকে বুকে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। এমন ঘটনা অন্য কোনো গ্রন্থের ক্ষেত্রে নেই। ফলে দুনিয়ার মুদ্রিত সকল কুরআন শরিফ বিনষ্ট করে ফেললেও কুরআনকে দুনিয়া থেকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। আর যে কেউ এর একটি অক্ষরেও যোজন-বিয়োজন করলে কিংবা ভুল পড়লে হাফেজগণ সেটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবেন।

বিশ্বব্যাপী ৭-১০ বছরের লক্ষ লক্ষ অবুঝ শিশুরা একটি বিশাল গ্রন্থকে শত শত বৎসর ধরে মুখস্থ করে যাচ্ছে, এটি তো নিঃসন্দেহে কুরআনের এক অলৌকিকত্ব ছাড়া কিছু নয়। কোনো বয়স্ক, শিক্ষিত লোক এই বিশাল গ্রন্থ মুখস্থ করলে (যেমনটি অনেকে করছেনও।) আমরা হয়তো তেমন অবাক হব না এই কারণে যে কঠিন হলেও বয়স্ক, শিক্ষিত লোকদের পক্ষে এ কাজ অসম্ভব নয়। কিন্তু ৭-৮ বছরের অবুঝ শিশু- যাদের এখনও কোনো বুঝ-বুদ্ধি হয়নি, যারা অনেকে কুরআন পড়া ছাড়া অন্য কোনো পড়ালেখাই জানে না। এমন শিশুরা লক্ষ লক্ষ পরিমাণে একটি বিশাল গ্রন্থকে মুখস্থ করে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে শত শত

বছর ধরে যা আর কোনো গ্রন্থের ক্ষেত্রে ঘটে না– এটিকে আমরা কী বলব? প্রিয় পাঠক, একটুও কী ভাবার নেই? কুরআন নাযিলকারী মহান আল্লাহ্ বলছেন, আমি স্বয়ং কুরআনের হেফাজত করব; তাহলে এটিই কি মহাকৌশলী, মহাবিজ্ঞ স্রষ্টার হেফাজতের অতুলনীয় ব্যবস্থা? প্রিয় পাঠক, নিজেই এর জবাব বের করুন।

কুরআন মুখস্থ করার এই কাজ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সাহাবীগণের (সঙ্গী) (রা.) দ্বারা শুরু হয়েছিল। কুরআন নাযিল শেষ হওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই সাহাবীগণের (রা.) মধ্যে একদল হাফেজে-কুরআন তৈরি হয়ে যান। এ জামাতের মধ্যে– প্রথম চার খলিফা (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত সা'আদ (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত হোযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা.), হযরত সালেম (রা.), হযরত আবু হুরায়রা (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত আমর ইবনুল আস (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.), হযরত মুয়াবিয়া (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব (রা.), হযরত আয়েশা (রা.), হযরত হাফসা (রা.), হযরত উম্মে সালামা (রা.)- এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। পৃথিবীতে এমন নমুনা দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যায় না, এটি কুরআনের মু'যিজা (অলৌকিকত্ব) ছাড়া কিছু নয়। মহান আল্লাহ্ এভাবেই তাঁর গ্রন্থের হেফাজত করে যাচ্ছেন।

কুরআনকে ফেরেশতা জিবরাঈল (আ.) মারফত দীর্ঘ তেইশ বৎসরে নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। কুরআনের যখন যা অবতীর্ণ হত সঙ্গে সঙ্গে তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এবং তাঁর সাহাবীগণ (রা.) মুখস্থ করে নিতেন এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে লিখে রাখা হত। ওহী দূত জিবরাঈল (আ.)- এর কাছ থেকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর কুরআন মুখস্থ করার প্রচণ্ড তৎপরতা দেখে আল্লাহ তাঁকে কুরআন মুছে না যাওয়ার নিশ্চয়তা দিয়ে জানালেন: "তাড়াতাড়ি শিখে নেওয়ার জন্য আপনি দ্রুত কুরআন আবৃতি করবেন না। [আপনার

অন্তরে] এর সংরক্ষণ ও [আপনাকে দিয়ে] পাঠ করানো আমারই দায়িত্ব।" (কিয়ামাহ, আয়াতঃ ১৬-১৭) একই সূরার ২০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে: "অতঃপর [মানুষের সম্মুখে আপনার মুখ দিয়ে] কুরআনের বিশদ বর্ণনাও আমারই দায়িত্ব।" অর্থাৎ, আপনাকে মুখস্থ করানো, আপনার অন্তরে তা যথাযথরূপে সংরক্ষিত রাখা এবং প্রয়োজনের সময় তা অবিকল পাঠ ও এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়ে দেওয়া– এসব আমার দায়িত্ব। স্রষ্টা প্রদত্ত এই ক্ষমতাবলে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর কুরআন মুখস্থ করা ও স্মরণ রাখার এমন এক ক্ষমতা অর্জিত হয় যে এর ফলে তাঁর অন্তর কুরআন সংরক্ষণের এক অলৌকিক দুর্গে পরিণত হয়। এর ফলে কুরআনের একটি অক্ষরেরও এদিক-সেদিক হলে তিনি তা সঙ্গে সঙ্গে শুধরে দিতেন। ফলে কুরআনের কোনোরূপ বিকৃতি সাধনের পথ শুরু থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে কুরআনের যখন যা অবতীর্ণ হত সঙ্গে সঙ্গে সেটুকু দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্দিষ্ট একাধিক সাহাবীদেরকে (রা.) দিয়ে মুখস্থ করিয়ে ও প্রচলিত পদ্ধতিতে লিখিয়ে রাখা হত যে কথা একটু পূর্বে উল্লেখ করেছি।

যেসকল মহান সাহাবী (রা.) কুরআন লিখে রাখার কাজ করতেন তাঁদের মধ্যে– হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.), প্রথম চার খলিফা (রা.), হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.), হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রা.), হযরত মুয়াবিয়া (রা.), হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা.), হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.), হযরত সাবেত ইবনে কায়েস (রা.), হযরত আব্বাস ইবনে সায়ীদ (রা.)- এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবার প্রত্যেক রমজান মাসে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীদূত জিবরাঈল (আ.)-কে সে সময় পর্যন্ত নাজিলকৃত কুরআন আবৃতি করে শুনাতেন এবং জিবরাঈল (আ.) নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবৃতি করে শুনাতেন। মৃত্যুর পূর্বে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীদূত জিবরাঈল (আ.)-কে গোটা কুরআন শরিফ দু'বার আবৃতি করে শুনিয়েছেন এবং জিবরাঈল (আ.)-এর কাছ থেকে দু'বার আবৃতি শুনেছেন।

অতএব দেখা যায়, কুরআন নাযিলের শুরু থেকে এর সংরক্ষণের জন্য স্বয়ং আল্লাহ এবং নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় যার ফলে কুরআনের যেকোনো প্রকার বিকৃত হওয়ার সকল রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে আজ আমাদের সম্মুখে যে কুরআন রয়েছে তা মহান ও পবিত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কুরআনের অবিকল রূপ। এতৎসত্ত্বেও কেউ যদি এতে কোনো সন্দেহ করতে চান তাহলে তিনি নিজে তা যাচাই করে দেখতে পারেন।

ফরাসি চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডা. মরিস বুকাইলি কুরআন নিয়ে প্রায় দশ বৎসর গবেষণা করেছেন এবং *The Bibel, The Quran and Science* নামে একটি গ্রন্থ লিখেছেন। সে গ্রন্থে তিনি লিখেছেন যে পৃথিবীতে যদি কোনো ধর্মীয় গ্রন্থকে অনুসরণ করতে হয় যা অবশ্যই ওহীগ্রন্থ এবং যাতে কোনো বিকৃতি সাধন ঘটেনি তাহলে সেটি অবশ্যই পবিত্র কুরআন। তিনি তাঁর গ্রন্থে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে একমাত্র কুরআন ছাড়া আর সকল ধর্মীয় গ্রন্থেই বিকৃতি সাধন ঘটেছে। কিন্তু কুরআনে একটি শব্দও ভুল নেই, এর একটি কথাও কেউ ভুল প্রমাণ করতে পারবে না, কুরআনে যেসব বৈজ্ঞানিক বক্তব্য রয়েছে তা সম্পূর্ণ নির্ভুল। একইভাবে তিনি তাঁর *The Origin of Man* গ্রন্থে দেখান, মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে বাইবেল যে বর্ণনা আমাদেরকে দিচ্ছে তার বেশিরভাগই ভুল এবং বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্যের বিপরীত। পক্ষান্তরে এ সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত তথ্যে কোনো ভুল নেই যা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্য দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং যেভাবেই দেখা হোক না কেন পৃথিবীতে পবিত্র কুরআন-ই একমাত্র অবিকৃত আল্লাহর বাণী ও অনুসরণযোগ্য, অন্য কোনোটি নয়।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম যে, আল্লাহর বাণীকে চিনতে পারার বা সনাক্ত করার পরীক্ষার মধ্যে অন্যতম হলো– মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ যেহেতু স্বয়ংসম্পূর্ণ, পবিত্র, পরিপূর্ণ ও নির্ভুল ফলে তাঁর বাণীর মধ্যে তদরূপ বৈশিষ্ট্য (পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।) পরিলক্ষিত হবেই। আপনি নিজেই এসবের কষ্টিপাথরে কুরআনকে এখন পরীক্ষা করতে

পারেন। আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি যে, একমাত্র কুরআনই এসব যাবতীয় বৈশিষ্ট্যে উত্তীর্ণ। আর কোনো গ্রন্থ এসব বৈশিষ্ট্যে উত্তীর্ণ নয়। ফলে কুরআন যে আল্লাহ্‌র একমাত্র অবিকৃত বাণী তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। তাহলে, ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে কুরআনকেই একমাত্র গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য নয় কী? চিন্তা করুন নিজেই।

সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি যিনি সত্যধর্মের পরিচয় দিতে পারেন

দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে সত্যধর্মের কথা জেনে নেওয়া। আল্লাহর পর মানুষের মধ্যে একমাত্র নবীগণ হলেন একশভাগ সত্যবাদী। কারণ সাধারণ মানুষ কথা বলে নিজের জ্ঞান দ্বারা আর নবীগণ কথা বলেন স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে। ফলে মানুষের কথা সর্বদা সঠিক হবে এমনটা মনে করার সুযোগ নেই। কিন্তু নবী বলতে স্রষ্টা মনোনীত এমন একজন মহাপুরুষকে বুঝায় যার সকল কথা ও কাজ স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়ায় তাতে কোনো ত্রুটি থাকার ন্যূনতম সুযোগও নেই। কেন নেই? কারণ নবী হলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত মানবসমাজের জন্য রোলমডেল। এখন নবী থেকে ত্রুটি বা গোনাহ সংগঠিত হওয়ার অর্থ হল গোটা মানবসমাজের স্খলন হওয়া। এজন্য নবীদের ব্যাপারে এটি মহান ও পবিত্র আল্লাহর বিশেষ ব্যবস্থা যে স্বয়ং আল্লাহ্ নবীদেরকে যেকোনো প্রকার গোনাহ থেকে হেফাজত করেন। এখন যেহেতু একমাত্র হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া পূর্ববর্তী সকল নবীগণের বাণী এবং তাঁদের উপর নাজিলকৃত ওহীগ্রন্থসমূহ অবিকৃতরূপে পাওয়া সম্ভব নয়, যে কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, কাজেই মানুষের মধ্যে একমাত্র হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হলেন সেই ব্যক্তি যার কাছ থেকে সত্যধর্মের কথা জেনে নেওয়া সবচেয়ে যৌক্তিক। স্মর্তব্য যে, অন্য যেকোনো নবীর অবিকৃত কথাও যদি পাওয়া যায় তাহলে নবী হওয়ার কারণে তাঁর সে কথা নির্দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য।

বইপত্র পড়ে সত্যধর্মের কথা জানা

এক্ষেত্রেও এমন কারো উপরই কেবল নির্ভর করা চলে যিনি সর্বদা সকল ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে। কিন্তু যেহেতু মানুষের পক্ষে এমনটি হওয়া সম্ভব নয় তাই মনুষ্যরচিত গ্রন্থের উপর নির্ভর করা সর্বদা আশঙ্কামুক্ত নয়। একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই যেহেতু সর্বদা সকল ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে এবং যেহেতু তাঁর রচিত গ্রন্থ অবিকৃতরূপে আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই এক্ষেত্রে এই ওহীগ্রন্থই হবে সেই মাধ্যম যেখান থেকে সত্যধর্মের কথা জেনে নেওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, নবীগণের (আ.) সকল কথা ও কাজ স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়ায় যেহেতু তাতে কোনো ত্রুটি থাকার ন্যূনতম সুযোগও নেই, তাই নবীগণের (আ.) সংরক্ষিত অবিকৃত বাণীর মাধ্যমেও সত্য ধর্মের কথা জেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যেহেতু একমাত্র হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া পূর্ববর্তী কোনো নবীর (আ.) বাণী অবিকৃতরূপে সংরক্ষিত নেই, যেকথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, ফলে দ্বিতীয়ত একমাত্র হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর বাণী সম্বলিত সংরক্ষিত গ্রন্থ (হাদিস) থেকেও সত্যধর্মের কথা জেনে নেওয়া যাবে। অবশ্য অন্য কারো গ্রন্থ থেকেও সত্যধর্মের কথা জানা যেতে পারে এই শর্তে যে, সেটি কুরআন ও হাদিসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে না অথবা কুরআন-হাদিস দ্বারা ভুল প্রতিপন্ন হবে না।

যদি এমন প্রশ্ন মনে উদয় হয়

এখন যে প্রশ্নগুলো দেখা দিতে পারে তা হল: (১) কুরআন যে মনুষ্যরচিত নয় এবং এটি যে আল্লাহর বাণী তার প্রমাণ কী? (২) কুরআন যে অবিকৃতরূপেই বর্তমান আছে তার প্রমাণ কী? (৩) হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আল্লাহর প্রেরিত নবী তার প্রমাণ কী? (৪) হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর নামে যেসব বাণী প্রচারিত হয়ে আসছে তার সত্যতা কী?

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই সর্বশেষ নবী: প্রমাণ

১ ও ২ নং বিষয়ে ইতোমধ্যে আলোচনা হয়েছে, আশা করি আমরা একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পেরেছি। এবার ৩ নং বিষয় অর্থাৎ, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আল্লাহ প্রেরিত নবী তার প্রমাণ কী? হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আল্লাহ প্রেরিত নবী না হবেন তাহলে কুরআন নাযিল হল কার উপর? একমাত্র মক্কার হাসেমী বংশের কোরাইশ গোত্রের আবদুল মোত্তালিবের পুত্র আবদুল্লাহ, তাঁর পুত্র হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া কি দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি আজ পর্যন্ত প্রমাণসহ দাবি করেছে যে, কুরআন আমার উপর নাযিল হয়েছে? তারপরও বলছি, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আল্লাহর রাসুল সে কথা কুরআন শরিফ ছাড়া অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও উল্লিখিত হয়েছে। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল এবং তাঁর পর যে আর কোনো নবী আসবেন না সে কথা কুরআনে বলে দেওয়া হয়েছে। যেমন: "মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসুল এবং সর্বশেষ নবী। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।" (আহ্যাব, আয়াত: ৪০)

আর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও বলেছেন: "আমিই সর্বশেষ নবী। আমার পর আর কোনো নবী আসবেন না।" পবিত্র কুরআনে মোট চারবার 'মুহাম্মদ' শব্দ উল্লিখিত হয়েছে। 'মুহাম্মদ' নামে একটি সূরাই নাযিল হয়েছে। সূরা ফাতহ্- এর ২৯ নম্বর আয়াতে পূর্বের মতো খোলাসা করে বলে দেওয়া হয়েছে: "মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (মুহাম্মদ আল্লাহ্ প্রেরিত রাসুল)...।" হযরত ঈসা (আ.)-এর একটি বক্তব্য কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে: "স্মরণ করো, মরিয়ম-তনয় ঈসা বলেছিলেন, হে বনী-ইস্রাঈল, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত রাসুল, আমি পূর্ববর্তী তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রাসুলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে আসবেন, তাঁর নাম হবে আহমদ...।" (সাফ্ফ, আয়াত: ৬) আর একথা তো সুবিধিত যে 'আহমদ' হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম- এর আরেক নাম। নবীর যুগের তাওরাত ও ইঞ্জিলধারীদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে : "এই কিতাবধারীরা (ইহুদি ও খ্রিস্টানরা) নবীকে (হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চেনে, যেমন নিজেদের পুত্রকে তারা চেনে।" (আনআম, আয়াতঃ ২০) কিন্তু তাওরাত ও ইঞ্জিলে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর যেসব বর্ণনা ছিল তা কৌশলে মুছে ফেলেছে। তাই বর্তমান তাওরাত ও ইঞ্জিলে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর কথা সরাসরি খুঁজে পাওয়া যায় না।

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর উল্লেখ

হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থ বেদ, উপনিষদ ও পুরাণে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখ রয়েছে। গীতা ও মহাভারত রচয়িতা মহর্ষি ব্যাসদেব ভবিষ্যপুরাণে উল্লেখ করেন: "একজন ম্লেচ্ছ ধর্মীয় শিক্ষক তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে আবির্ভূত হবেন। তাঁর নাম হবে মহম্মদ।" [ভবিষ্যপুরাণ: প্রতি সর্গ পর্ব: ৩:৩, ৩, ৫-৮, উদ্ধৃত, এ. এইচ. বিদ্যার্থী ও ইউ. আলী। সোমমৌলি অধিকারী ও সিদ্ধার্থ মজুমদার অনূদিত, *পারসি, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)*। কলকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স। পৃ. ২৭।] ব্যাস ম্লেচ্ছ শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা হল: "যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, প্রখর বুদ্ধি আছে, ধর্মপ্রাণ এবং ভগবানে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে সেই ব্যক্তি-ই জ্ঞানী 'ম্লেচ্ছ'।" মহর্ষি ব্যাস আরো উল্লেখ করেছেন: এই মহামানবের নাম হবে মহম্মদ। তিনি আরবের লোক হবেন। তিনি সমস্ত ত্রুটি হতে মুক্ত হবেন এবং ঐশ্বরিক হবেন। ভারতের রাজা তাঁকে শ্রদ্ধা দেখাবেন। তিনি মানবজাতির গর্ব হবেন। মহর্ষি তাঁর পদতলে আশ্রয় চেয়েছেন...। (*প্রাগুক্ত*। পৃ. ২৭-২৮।)

ভবিষ্যপুরাণে উল্লেখ রয়েছে: এই মহামানবের অনুসারীদের লিঙ্গাগ্র ছেদিত হবে, টিকি থাকবে না, দাড়ি রাখবে, বিপ্লব ঘটাবে, আযান দেবে এবং শুয়োরের মাংস ছাড়া বৈধ সবকিছুই খাবে। তারা যুদ্ধের

মাধ্যমে নিজেদের শুদ্ধ করে তুলবে। অধার্মিক দেশগুলির সঙ্গে যুদ্ধের জন্য তারা মুসলমান নামে পরিচিত হবে.......। (*প্রাগুক্ত*। পৃ. ২৯-৩০।)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এখানে যুদ্ধের যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তার সবগুলো ছিল এবং ভবিষ্যতেও হবে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য। যুদ্ধ ছাড়া যখন সত্য টিকিয়ে রাখার আর কোনো গতি ছিল না বা থাকবে না তখনই কেবল যুদ্ধ করা হয়েছে ও হবে। একথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, নবীগণের কোনো কাজ সেটা যুদ্ধই হোক বা অন্য কিছুই হোক তা আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া হয় না। যেমন আল্লাহ এমন নির্দেশ দিয়ে বলছেন: "হে নবী, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন।" (তাওবাহ, আয়াত: ৭৩।)

অথর্ব বেদের কুন্তপসুক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রে আছে: "উষ্ট্রা যস্য প্রবাহিনো বধূমলেতা দ্বির্দর্শ। বর্ষা রহস্য নি জিহীষত্তে দিব ঈষমাণ উপস্পৃশ্য।" গ্রিফিথ, পন্ডিত রাজারাম এর যে অনুবাদ করেছেন তা হল: "বিশটি উট তাঁর রথ টানে, তাঁর পাশে তাঁর স্ত্রীরাও থাকেন। রথের চূড়া যেন আকাশ ছুঁয়ে যায়।" এ. এইচ. বিদ্যার্থী ও ইউ. আলী তাঁদের *পারসি, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)* গ্রন্থে লেখেন: "এখান থেকেই পরিষ্কার, যে ঋষি আবির্ভূত হবেন তিনি হবেন আরবের লোক। একজন ভারতীয় ঋষি উটে চাপতে পারেন না। 'ধর্ম শাস্ত্রের' অনুশাসন অনুযায়ী ভারতীয় ঋষি উটের দুগ্ধ বা মাংস খেতে পারেন না। এবং সেজন্য তিনি উটে চাপতেও পারেন না। ব্রাহ্মণদেরও উটে চাপা নিষেধ।"(*প্রাগুক্ত*। পৃ. ৩৭-৩৮।)

কুন্তপসুক্তের তৃতীয় মন্ত্রে আছে: "এষ ইষায় মামহে শতং নিষ্কান্ দশ স্রজঃ। ত্রীনি শতান্যর্বতাং সহস্রা দশ গোনাম্।"(শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী (অনু. ও সম্পা.)। *অথর্ববেদ-সংহিতা*। ২০০০। কলকাতা: হরফ প্রকাশনী। পৃ. ৪৭৩।) এ. এইচ. বিদ্যার্থী ও ইউ. আলী তাঁদের উপরিউক্ত গ্রন্থে লেখেন: "এই মন্ত্রে ঋষির নামকরণ করা হয়েছে মমহ্। ভারতে বা বিশ্বের অন্য কোনো ঋষি বা পয়গম্বরের এই নাম ছিল না। এই শব্দটির উৎপত্তি 'মহ' শব্দ থেকে, যার অর্থ শ্রদ্ধেয়, পূজনীয়, মহৎ

ইত্যাদি (মনিয়ের উইলিয়ামস কৃত সংস্কৃত-ইংরেজি শব্দকোষ)।" এই লেখকদ্বয়ের মতে, এই *মমহ* বলতে *মুহাম্মদ* বুঝায়। গজনীর সুলতান মাহমুদ যেভাবে *মামুদ* হয়ে যায় ঠিক তেমনি *মুহম্মদ* বা *মুহাম্মদ* হয়েছে 'মমহ'। (*প্রাগুক্ত*। পৃ. ৩৯-৪০।)

অথর্ববেদীয় উপনিষদে আছে: "অল্য ইল্ললে মিত্রাবরুণো রাজা। তস্মাৎ তানি দিব্যানি পুনস্পং দুস্যু। হবয়ামি মিলং কবর ইল্ললং। অল্লো রসুল মহমদকং। বরস্য অল্লে অল্লাম ইল্লোল্লেতি ইল্লাল্লা ॥৯॥" ভবিষ্যপুরাণে আছে: "এতস্মিন্নন্তরে ম্লেচ্ছ আচার্যেন সমন্বিত। মহামদ ইতি খ্যাতঃ শিষ্যশাখা সমন্বিতঃ ॥৫॥ নৃপশ্চৈব্য মহাদেবং মরুস্থল নিবাসিনম্। গঙ্গাজলৈশ্চ সংস্নাপ্য পঞ্চগব্য সমন্বিতৈঃ। চন্দনাদিভিরভ্যর্চ তুষ্টাব মনসা হরম ॥৬॥ নমস্তে গিরিজানাথ মরুস্থল নিবাসিনে। ত্রিপুরাসুরনাশায়া বহুমায়া প্রবর্তিনে ॥৭॥" অল্লোপনিষদে আছে: হোতারমিন্দ্রো হোতারমিন্দ্রো মহাসুরিন্দ্রাঃ। অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণং ব্রহ্মাণ অল্লাম। অল্লো রসুল মহমদকং বরস্য অল্লো আল্লম। আদল্লাহ্‌বুকমে ককম অল্লাবুক নিখাতকম ॥৩॥" উপরিউক্ত মন্ত্রে আল্লাহ, মুহাম্মদ, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল এবং মুহাম্মদ মরুদেশের লোক হবেন– তা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

ভারতের এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর বেদ প্রকাশ তাঁর এক গবেষণায় উল্লেখ করেন: হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বেদে 'কলির অবতার' বলে যার উল্লেখ রয়েছে, যিনি শেষ যুগে আবির্ভূত হবেন এবং হিন্দুরা যাকে পূজা দেবে বলে প্রতীক্ষায় আছে, তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন– সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী আরবের মুহাম্মদ ইব্‌নে আবদুল্লাহ। প্রফেসর বেদ প্রকাশ ধর্মগ্রন্থ বেদ থেকে ৯টি যুক্তি তুলে ধরেছেন। যেমন: হিন্দু ধর্মের বাণী অনুযায়ী 'কলির অবতার' জন্ম নেবেন একটি দ্বীপদেশে। 'কলির অবতার'- এর পিতার নাম হবে 'বিষ্ণু ভাগত' এবং মায়ের নাম হবে 'সোমানির'। এই 'দ্বীপদেশ' হল সেই আরব ভূখণ্ড যা 'জাযীরাতুল আরব' বলে পরিচিত। কাজেই এটা মুহাম্মদ- এর ব্যাপারেই প্রযোজ্য।

সংস্কৃতে 'বিষ্ণু'- এর অর্থ হল আল্লাহ এবং 'ভাগত'- এর অর্থ হল দাস। সুতরাং আরবিতে এর অর্থ দাঁড়ায়- আবদুল্লাহ বা আল্লাহর দাস।

আর 'সোমানির' অর্থ হল শান্তি; আরবিতে আমিনা অর্থ শান্তি। অতএব এসবের প্রেক্ষিতে 'কলির অবতার' মুহাম্মদ ছাড়া আর কেউ নন, কারণ তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ আর মায়ের নাম আমেনা। পণ্ডিত বেদ প্রকাশ এভাবে নয়টি প্রমাণ পেশ করেছেন যে, হিন্দু ধর্মে যে কলির অবতার- এর কথা উল্লেখ আছে, তিনি নিঃসন্দেহে ইসলামের নবী মুহাম্মদ" সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। (*প্রাগুক্ত*। পৃ. ১০৭) বিস্তারিত জানতে ধর্মাচার্য অধ্যাপক বেদপ্রকাশ উপাধ্যায় লিখিত বই- ১. *বেদ-পুরাণে আল্লাহ ও হযরত মুহাম্মদ* এবং ২. *কল্কি অবতার ও মুহাম্মদ সাহেব* অবশ্যই পড়ুন।

বৌদ্ধদের গ্রন্থ *দিঘা নিকায়ায়* আছে: "মানুষ যখন গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ভুলে যাবে, তখন আর একজন বুদ্ধ আসবেন, তাঁর নাম হবে 'মৈত্তেয়' (সংস্কৃতে মৈত্রেয়) অর্থাৎ, শান্তি ও করুণার বুদ্ধ।" সিংহলী সূত্রে পাওয়া যায়: আনন্দ বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার মৃত্যুর পর কে আমাদিগকে উপদেশ দিবে? জবাবে বুদ্ধ বললেন– আমিই একমাত্র বুদ্ধ বা শেষ বুদ্ধ নই। যথাসময়ে আরো একজন বুদ্ধ আসবেন, তিনি আমার চেয়েও পবিত্র ও আলোকপ্রাপ্ত... তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মমত প্রচার করবেন। আনন্দ জিজ্ঞেস করলেন, তাঁকে আমরা চিনব কী করে? বুদ্ধ বললেন, তিনি মৈত্রেয় নামে পরিচিত হবেন। (*প্রাগুক্ত*। পৃ. ১০৮; এ. এইচ. বিদ্যার্থী ও ইউ. আলী। *প্রাগুক্ত*। পৃ. ৮৬-৮৭।)

এই মৈত্রেয় যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, সকল নবীই শান্তি ও করুণার বাহক হলেও একমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কারো 'শান্তি ও করুণার নবী'- এই উপাধি ছিল না, 'শান্তি ও করুণার নবী' বলে একমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হচ্ছেন একমাত্র নবী যাকে পবিত্র কুরআন শরিফে 'রাহ্‌মাতুল্লিল আলামিন'- অর্থাৎ, সমগ্র জাহানের জন্য রহমত তথা শান্তি ও করুণার নবী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনে সে কথাই বলা হয়েছে: "আমি আপনাকে জগতসমূহের জন্য রহমতস্বরূপ

প্রেরণ করেছি।" (আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭)

পার্সি ধর্মগ্রন্থের নাম হল জিন্দাবেস্তা ও দসাতির। জিন্দাবেস্তায় আছে: "আমি ঘোষণা করছি, হে স্তিতাম জরথুষ্ট্র, পবিত্র আহমদ নিশ্চয়ই আসবেন, যাঁর নিকট হতে তোমরা সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য, সৎ কার্য এবং বিশুদ্ধ ধর্ম লাভ করবে।" দসাতিরে আছে: "যখন পার্সিরা নিজেদের ধর্ম ভুলে গিয়ে নৈতিক অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হবে, তখন আরব দেশে এক মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করবেন, যাঁর শিষ্যরা পারস্যদেশ এবং দুর্ধর্ষ পারসিক জাতিকে পরাজিত করবে। নিজেদের মন্দিরে অগ্নিপূজা না করে তারা ইব্রাহিমের কাবা-ঘরের দিকে মুখ করে প্রার্থনা করবে; সেই কাবা প্রতিমামুক্ত হবে। সেই মহাপুরুষের শিষ্যরা বিশ্ববাসীর পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ হবে।" (মাওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীন। *প্রাগুক্ত।* পৃ. ১০৬।)

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, হিন্দু, বৌদ্ধ, পার্সি ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থসমূহে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী এল কীভাবে? এটি অসম্ভব নয়। কারণ, ঐসব গ্রন্থের লেখকগণের পক্ষে পূর্ববর্তী কিংবা সমকালীন ওহীগ্রন্থ থেকে এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব ছিল না।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর বাণী অবিকৃত আছে

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর নামে যেসব বাণী বা হাদিস প্রচারিত হয়ে আসছে তার সত্যতা কী? আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ্ বলেন: "আমি স্বয়ং এই উপদেশ গ্রন্থ (কুরআন) নাযিল করেছি এবং আমি নিজে এর হেফাজতকারী (হিজর, আয়াত: ৯)।" এখানে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, কুরআন বলতে কী বুঝায়? শুধু কুরআনের শব্দাবলির নাম কুরআন নয় এবং শুধু কুরআনের অর্থসম্ভারের নামও কুরআন নয়। বরং, 'কুরআনের শব্দাবলি এবং অর্থসম্ভার'- এই উভয়ের সমষ্টিকে কুরআন বলা হয়। সুতরাং কুরআনের সংরক্ষণ বলতে এর শব্দাবলি এবং অর্থসম্ভার- উভয়ের সংরক্ষণকে

বুঝায়। কুরআনের অর্থসম্ভার তা-ই যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন। কুরআনে বলা হয়েছেঃ "আপনাকে এজন্য প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে আপনি লোকদেরকে কুরআনের মর্ম বলে দেন, যা তাদের জন্য নাযিল করা হয়েছে।" এ কারণেই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও বলেছেন, "আমি মানবজাতির প্রতি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি।"

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন কুরআনের অর্থ বর্ণনা করা ও শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে, তখন তিনি উম্মতকে যেসব বক্তব্য ও কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন সেসব বক্তব্য ও কর্মের নামই হাদিস। এখন হাদিস প্রকৃতপক্ষে যেহেতু কুরআনের *ব্যাখ্যা ও এর ব্যবহার*, কাজেই হাদিসের সংরক্ষণও স্বয়ং আল্লাহর দায়িত্বে হবে, যেহেতু আল্লাহ বলছেন– আমি স্বয়ং এই উপদেশ গ্রন্থ (কুরআন) নাযিল করেছি এবং আমি নিজে এর হেফাজতকারী। কারণ, আল্লাহ কেবলমাত্র কুরআনের শব্দাবলির সংরক্ষণ করবেন আর যার মাধ্যমে [হাদিস] এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ করা হয়েছে তা সংরক্ষণ করা হবে না– এটা গ্রহণযোগ্য নয়।

পবিত্র কুরআন আল্লাহর প্রত্যক্ষ বিধান বা ওহী। সুন্নাহ তথা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর জীবনাদর্শ অনুসরণের জন্য কুরআনে বারবার আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন কুরআনে বলা হয়েছেঃ "রাসুলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।" (আহযাবঃ ২১।) অন্যত্র বলা হয়েছে, "হে আমার প্রিয় নবী, আপনি বিশ্ববাসীকে বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তাহলে আমার অনুসরণ, অনুকরণ কর...।" (আল-ইমরানঃ ৩১।) অন্যত্র বলা হয়েছে, "হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য কর...।" (নিসাঃ ৫৯।) উল্লেখ্য যে, সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসরণই কুরআন তথা আল্লাহর একনিষ্ঠ অনুসরণ। পবিত্র কুরআন হলো বিশ্ব মানবসমাজের ইহকালীন কল্যাণ ও সাফল্য এবং পরকালীন মহা-সাফল্য লাভের জন্য সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত বিধান, আর সুন্নাহ তথা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম- এর জীবনাদর্শ হলো কুরআনের বাস্তব পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত বা এ্যাপলিকেশন।

আল্লাহর ওহী দু'ই প্রকার, একটি কুরআন যা তিলাওয়াত করা হয়, যার ভাষা ও মর্ম উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। দ্বিতীয় প্রকার ওহী হল হাদীস যার ভাষা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর এবং মর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে। সেজন্যই কুরআন ও হাদিস- উভয়ের বাস্তবায়ন শুধু ওয়াজিবই নয় বরং কুরআন ও হাদিস তথা সুন্নাহ উভয়ের অনুসরণ ও বাস্তবায়নই ফরয। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সম্মানিত সাহাবীগণ (রা.) যখন একথা জানলেন তখন হাদিস সংরক্ষণের গুরুত্ব বুঝতে তাঁদের আর বাকি থাকল না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বিদায় নিবেন, কিন্তু তাঁর পবিত্র বাণী যদি সংরক্ষণ করা না হয় তাহলে ভবিষ্যতে মানুষ কুরআন বুঝতে মারাত্মক সমস্যায় নিপতিত হবে। তাই সাহাবীগণ (রা.) হাদিস সংরক্ষণে যথাযথ তৎপর হলেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)- এর মতো সাহাবীগণ দ্বীনের এই রত্নভাণ্ডার হাসিল ও সংরক্ষণের জন্য নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে এবং খেয়ে না খেয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সঙ্গে সর্বদা অবস্থান করতে শুরু করেন, এবং তাঁরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর মৃত্যু পর্যন্ত এই কাজ বজায় রেখেছিলেন।

এখানে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, সাহাবায়ে আজমাইন (রা.) নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর প্রতি ভালবাসার যে নমুনা দেখিয়ে গিয়েছেন, তার দ্বিতীয় নমুনা বিশ্বে নেই। ফলে সাহাবায়ে আজমাইন (রা.) নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর প্রতিটি কথা ও কাজকে নিজের জীবনের চাইতে বেশি গুরুত্ব দিতেন– তাঁদের চরিত্রকে আল্লাহ এভাবেই তৈরি করে দিয়েছিলেন। যদিও হাদিসের নামে মিথ্যা কথার প্রচার হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয় কিন্তু সেটি ইসলাম বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। কেননা হাদিস কখনো কুরআনের বিপক্ষে যাবে না। ছিহাছিত্তা বা ছয় হাদিসগ্রন্থের হাদিসসমূহ এমন চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংকলন করা হয়েছে ফলে

এসব হাদিসের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ নেই। কেউ যদি নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর বিশুদ্ধ বাণী পেতে চায় তাহলে তার জন্য এই ছয় গ্রন্থই যথেষ্ট হবে।

ইসলাম একমাত্র সত্যধর্ম: প্রমাণ

ইতোমধ্যে যে আলোচনা করা হয়েছে তাতে পবিত্র কুরআন, কুরআন যাঁর উপর নাযিল হয়েছে সেই প্রতীক্ষিত মহাপুরুষ সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হাদিস সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা আমরা পেয়েছি। এখন পবিত্র কুরআন এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে কী বলেন তা আমরা লক্ষ্য করব।

প্রথমত, পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে: "নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম। এবং যাদের প্রতি কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের কাছে প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও কেবলমাত্র পরস্পর বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে তারা মতবিরোধে লিপ্ত রয়েছে। যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফরী করে তাদের জানা উচিত ছিল যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত।" (আল-ইমরান: ১৯।) একই সূরার ৮৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে: "যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম অবলম্বন করে, তার সে ধর্ম কস্মিনকালেও গ্রহণ করা হবে না এবং পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।"

দ্বিতীয়ত, বিদায় হজ্জের ভাষণে নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আল্লাহ্ ঘোষণা করে দিয়েছেন, "আজ আমি (আল্লাহ্) তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন (ধর্ম) ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন (ধর্ম) হিসেবে মনোনীত করলাম।" (মায়েদা: ৩।)

সুতরাং কোনো রকম পরিবর্তন, সংযোজন ও সংশোধন ব্যতিরেকে তোমরা একমাত্র এই ইসলামের অনুসরণ করবে। একই ভাষণে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

আমি সর্বশেষ নবী, আমার পরে আর কোনো নবী আসবেন না। আমার পরে ওহী (ওহী বাণী/ওহী গ্রন্থ) আসা চিরতরে বন্ধ।

ইসলামই যদি একমাত্র সত্যধর্ম হয়, তাহলে পূর্ববর্তী নবীগণের (আ.) ধর্ম কী ছিল?

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে ইসলামই যদি একমাত্র সত্যধর্ম হয়, তাহলে পূর্ববর্তী নবীগণের (আ.) ধর্ম কী ছিল। এ কথা শুরুতেই বলা হয়েছিল যে, বিশ্বজাহানের একজন মালিক 'এক মানুষ জাতিকে' সৃষ্টি করে তাদের জন্য নানা ধর্ম সৃষ্টি করে তাদেরকে সেসব নানা ধর্মের নানা মত ও পথের দ্বারা বিভেদ-বৈষম্যের মাঝে ঠেলে দিতে পারেন না। ইসলাম অর্থ হচ্ছে এক আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়ার মাধ্যমে ইহ-পরকালে পরম শান্তি লাভ করা যার মৌখিক স্বীকৃতি হচ্ছে– *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্*, অর্থ– *আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই*।

লক্ষ্য করুন, সাধারণ একজন রাষ্ট্রনায়কের প্রতি জনগণের পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শিত না হওয়াকে রাষ্ট্রনায়ক কখনই ভালোচোখে দেখেন না। অথচ রাষ্ট্রনায়ক কোনো কিছুরই স্রষ্টা নন, বড়জোড় রাষ্ট্র ও এর সম্পদের একজন সংরক্ষক মাত্র এবং তিনি অমুখাপেক্ষী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নন। গোটা পৃথিবী- মানুষ, আসমান, জমীন, সাগর, পাহাড়, গাছপালা, পশুপাখি, ফসল– সব কিছুর স্রষ্টা ও লালন-পালনকারী একমাত্র একক আল্লাহ। চিন্তা করে দেখুন, এই একক আল্লাহর দান-অনুগ্রহ ছাড়া কোনো জীবের এক সেকেন্ডও বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এজন্যই বলা হয় সবাই তাঁর প্রতি অবশ্যম্ভাবীরূপে মুখাপেক্ষী, তিনি কারো প্রতি লেশমাত্র মুখাপেক্ষী নন, তিনি এককরূপে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

সুতরাং তাঁর প্রতি সৃষ্টজীবের নিরংকুশ আনুগত্য প্রদর্শিত হবে এটাই তো সবচেয়ে যৌক্তিক কথা; ইসলামের কালেমা– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই- এর অর্থ এটাই। সুতরাং অবিকৃত ওহীগ্রন্থের অনুসরণ ছাড়া এই আনুগত্য কখনই হতে পারে না। সকল নবী (আ.) ইসলামের এই একই মূল বক্তব্য– আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই- এর দাওয়াত দিয়েছেন। পার্থক্য হয়েছে

কেবল এই বক্তব্যের উপর আমল সংক্রান্ত বিধি-বিধানের। বিধি-বিধানের এই পার্থক্য হয়েছে যুগ ও সময়ের চাহিদাজনিত কারণে। কাজেই স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ মানুষের জন্য একটি ধর্মই সৃষ্টি করেছেন যার নাম ইসলাম, ফলে সব মানুষ এক উম্মত তথা ধর্মাবলম্বী ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তারা শয়তনের ধোঁকায় পড়ে নানা মনগড়া পথে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কুরআনে সে কথাই বলা হয়েছে:

"আর সমস্ত মানুষ একই উম্মতভুক্ত (একই ধর্মভুক্ত) ছিল, পরে (কুফর ও শিরকের দ্বারা) পৃথক হয়ে গেছে।" (ইউনুস: ১৯)

মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- সকলেই সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত সেই ইসলাম ধর্ম প্রচার করে গেছেন। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে: "আমি তোমাদের জন্য ঐ দ্বীনই (ধর্ম) জারি করেছি যার নির্দেশ ইতোপূর্বে দিয়েছিলাম নূহ্কে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি তোমাকে, যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহিম, মূসা ও ঈসাকে- এই বলে যে, তোমরা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে মতভেদ করো না।" (শূরা: ১৩।) উল্লেখ্য যে, কুরআনের পরিভাষায় *দ্বীন* বলতে ঐসব মূলনীতি ও বিধি-বিধানকে বুঝায় যা প্রথম নবী হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সব নবীগণের (আ.) মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান ছিল।

প্রশ্ন হতে পারে যে, এখানে প্রথম নবী হযরত আদম (আ.)- এর কথা দিয়ে শুরু না করে হযরত নূহ্ (আ.)-কে দিয়ে শুরু হল কেন? জবাব হল– হযরত আদম (আ.)- এর আমলে মানুষের মধ্যে শিরকের প্রচলন হয়নি। কুফর ও শিরকের সাথে দ্বন্দ্ব হযরত নূহ্ (আ.)- এর আমল থেকে শুরু হয়েছে। একই উম্মতভুক্ত বা ধর্মভুক্ত সকল মানুষ শয়তানের ধোঁকায় পড়ে কুফর ও শিরকের মাধ্যমে বিভিন্ন মনগড়া মতবাদে বিভক্ত হয়ে পড়ার যে কথা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি, সেটি হযরত নূহ্ (আ.)- এর আমল থেকে শুরু হয়েছিল। অর্থাৎ, "আর সমস্ত মানুষ একই উম্মতভুক্ত (একই ধর্মভূক্ত) ছিল, পরে (কুফর ও শিরকের দ্বারা) পৃথক হয়ে গেছে।"– দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে।

কাজেই ইসলামের যে মূল বক্তব্য- একত্ববাদ অর্থাৎ, এক আল্লাহর উপাসনা করা, সেটা কুফর ও শিরকের দ্বারা হুমকির সম্মুখীন হওয়া ও সেটা বজায় রাখার মধ্যে যে সংগ্রাম– সেই দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত নূহ্ (আ.)-ই প্রথম নবী। তাই তাঁর মাধ্যমেই এই আয়াতে নবীগণের আলোচনা শুরু হয়েছে। তাহলে আসুন শুনি, হযরত নূহ্ (আ.) কী বলেন?

হযরত নূহ্ (আ.) বলেছিলেন: "আমি মুসলিম হওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।" (ইউনুস: ৭২।) হযরত ইব্রাহিম (আ.) বলেছিলেন: "হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের উভয়কে মুসলিম তথা তোমার অনুগত বানাও এবং আমাদের বংশধর হতেও এক উম্মতে মুসলিমা অর্থাৎ তোমার এক অনুগত উম্মত বানাও।" (বাকারা: ১২৮।) হযরত ইব্রাহিম (আ.) তাঁর বংশধরদেরকে বলেছিলেন: "তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" (বাকারা: ১৩২।) হযরত ঈসা (আ.) বলেছিলেন: "সাক্ষী থাকুন, আমরা মুসলিম।" (আল-ইমরান: ৫২।)

মুসলমান তাদেরকেই বলা হয় যারা আল্লাহর নিকট সর্বান্তকরণে আত্মসমর্পণ করে, আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধানকে মেনে চলে। আর ইসলামের অর্থও তা-ই। তাই এঁদের সবার ধর্ম ইসলাম।

ইসলামের এই ধারা শুরু হয়েছিল সর্বপ্রথম মানব, নবী হযরত আদম (আ.)- এর মাধ্যমে, আর বিভিন্ন নবীগণ (আ.) এবং তাঁদের উপর নাযিলকৃত ওহী গ্রন্থসমূহের মধ্যে দিয়ে তা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ওহীগ্রন্থ কুরআনের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে ইসলামের পূর্ববর্তী রূপসমূহ অপরিণত ছিল। প্রত্যেক নবীর (আ.) যামানার ইসলাম সেই যুগের নিরীখে পরিপূর্ণ ছিল, তবে সেগুলো ছিল ঐসব যুগের জন্য।

আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর ইসলামের পরিপূর্ণতা বলবৎ থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। কুরআনে বলা হয়েছে: "আজ আমি (আল্লাহ্) তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে (ধর্মকে) পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং

ইসলামকে তোমদের জন্য দ্বীন (ধর্ম) হিসেবে মনোনীত করলাম।" এ আয়াতের সারমর্ম হলো– সর্বপ্রথম মানব নবী হযরত আদম (আ.)-এর মাধ্যমে যে ইসলামের যাত্রা আমি (আল্লাহ্) শুরু করেছিলাম এবং বিভিন্ন নবীগণ (আ.) এবং তাঁদের উপর নাযিলকৃত ওহীগ্রন্থসমূহের মধ্যে দিয়ে যে ইসলামে সময়ের প্রয়োজনে পরিবর্তন, পরিবর্ধন করেছি, আজকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ওহীগ্রন্থ কুরআনের মাধ্যমে ইসলামের এই ঐতিহাসিক ধারাকে শেষপূর্বক কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য পরিপূর্ণ, চূড়ান্ত করে দিলাম এবং কিয়ামত পর্যন্ত এই ইসলামকেই মানবমণ্ডলির জন্য মনোনীত করলাম।

কাজেই প্রত্যেক যুগে প্রেরিত নবী (আ.) ও ওহীগ্রন্থের উপর ঈমান আনা না আনার উপর যেমন সংশ্লিষ্ট যুগের মানবমণ্ডলির মুক্তি অর্জন নির্ভর করেছিল, তেমনি দুনিয়াতে পবিত্র কুরআন আসার পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এই গ্রন্থ এবং যার উপর এই গ্রন্থ নাযিল হয়েছে সেই প্রতীক্ষিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর উপর ঈমান আনা না আনার উপর বিশ্ব-মানবমণ্ডলির পরকালীন মুক্তি ও শান্তি নির্ভর করবে।

উদাহরণস্বরূপ, কোনো দেশের পার্লামেন্ট ও সংবিধান আছে, এই সংবিধান মানা সকল নাগরিকের জন্য বাধ্যতামূলক। আবার, যখন যিনি প্রধানমন্ত্রী হন তিনি তখন নতুন নতুন আইন প্রনয়ণ করেন এবং সংশ্লিষ্ট পূর্বের আইন বাতিল করেন। তখন নাগরিকদের জন্য নতুন আইন মানা বাধ্যতামূলক হয়। এখন কেউ যদি বলে, আমি পূর্বের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বলবৎকৃত আইন মানব, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বলবৎকৃত আইন মানব না, নতুন প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক আরোপিত ট্যাক্স দেব না, তাহলে সে অবশ্যই রাষ্ট্রবিরোধী বলে সাব্যস্ত হবে। ঠিক তেমনি, কুরআন নামক আইন (বিধান) চলে আসার পর পূর্ববর্তী সকল ধর্মীয় আইন বাতিল হয়ে গিয়েছে। এখন এই নতুন বিধান তথা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রচারিত ইসলামি বিধান না মানলে আল্লাহর আইনে সেও রাষ্ট্রবিরোধী এবং ভ্রষ্ট বলে বিবেচিত

হবে। কাজেই ইসলাম গ্রহণ ব্যতিরেকে কোনো মানুষের পক্ষে পরকালে মুক্তি লাভ করার কোনো সুযোগ নেই, তাকে চির-জাহান্নামী হতে হবে।

এ কথাই মহান আল্লাহ্ বলছেন:

"যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম অবলম্বন করে, তার সে ধর্ম কস্মিনকালেও গ্রহণ করা হবে না এবং পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" (আল-ইমরান: ১৯।) আর এখানে 'ক্ষতিগ্রস্ত' হওয়ার চূড়ান্ত পর্যায় বলতে চির-জাহান্নামী হওয়াকে বুঝায়। এসকল লোক দুনিয়াতে যত ভালো কাজই করুক না কেন, যেহেতু তারা আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসুলকে (সা:)-কে অমান্য করেছে, তাই পরকালে তাদের সেসব ভালো কাজের কোনোই মূল্য থাকবে না। এ সমস্ত লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন:

"যারা তাদের রবের আয়াত ও রবের সাক্ষাতকে (কিয়ামত দিবস) অস্বীকার করে, তাদের কর্ম নিষ্ফল, কিয়ামতের দিন এদের কোনো গুরুত্ব নেই। জাহান্নাম– ওটাই এদের প্রতিফল, কারণ তারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলি ও রাসূলগণকে বিদ্রুপের বিষয় বানিয়েছে।" (কাহাফ: ১০৫-১০৬।)

আরো কিছু প্রশ্ন?

আরেকটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, সময়ের প্রয়োজনে যদি নতুন ওহীগ্রন্থের প্রয়োজন হয়, তাহলে কুরআনের পর কেন আরো ওহীগ্রন্থ আসবে না এবং কুরআন কীভাবে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের চাহিদা মেটাবে? অন্যদিকে কুরআনই যদি কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের সকল চাহিদা মেটাবে, তাহলে সর্বশেষে এটি নাযিল না করে প্রথম থেকেই তা বলবৎ করে দিলেইবা কী অসুবিধা ছিল?

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে, সৃষ্টিকর্তা একটি মেগাপ্রজেক্ট বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এই মেগাপ্রজেক্টের উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টিকর্তার নানা গুণের প্রকাশ ঘটানো এবং মানুষকে এতে পরীক্ষা করা যে কে তাঁর বিধান মেনে চলে আর কে অগ্রাহ্য

করে। এই মেগাপ্রজেক্ট বাস্তবায়নের মূল বাহক নির্বাচন করা হয়েছে রাহমাতুল্লিল আ'লামিন, সায়্যিদুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। যুগে যুগে বিভিন্ন নবী ও রাসুলগণের মাধ্যমে এই মেগাপ্রজেক্ট বাস্তবায়ন শুরু হলেও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর মাধ্যমেই এর চরম পরিণতি লাভের ব্যবস্থা করা হয়েছে যা কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই যেহেতু এই প্রজেক্ট বাস্তবায়নের মূল বাহক তাই বিশ্বের মানুষ ও পরিবেশকে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর জন্য আবির্ভাবযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য পূর্ববর্তী নবী-রাসুলগণকে প্রেরণ করা হয়েছে। মেগাপ্রজেক্টে পরীক্ষাধীন মানবজাতির সাফল্য ও ব্যর্থতার মাপকাঠি হবে আল্লাহর বিধান যা বিভিন্ন নবী ও রাসুলগণের মাধ্যমে মানবজাতিকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে; এবং বিধানসমেত ব্যবস্থার নাম হল ইসলাম যা সকল মানুষের দুনিয়াদারীর একমাত্র দ্বীন হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে (যেমনঃ "নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম," আল-ইমরানঃ ১৯।)

দুনিয়াদারীর জন্য নির্দিষ্ট এই দ্বীন তথা ইসলামের চরম পরিণতি লাভ করেছে পবিত্র কুরআনুল কারীমে। যারা এই ব্যবস্থাপত্র বিশ্বাস ও অনুসরণ করে তারা মুসলিম। যেহেতু কুরআনী ব্যবস্থাই হল ইসলামের পরিপূর্ণ চূড়ান্ত রূপ কাজেই এর জন্য মানুষ ও পরিবেশকে প্রস্তুত করার প্রয়োজন ছিল। একজন মানুষের যদি লক্ষ্য হয় সে এমএ ক্লাস পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করবে তাহলে তাকে অবশ্যই ১ম শ্রেণি থেকে শুরু করতে হয়, অবশেষে এমএ ক্লাসে গিয়ে সে পরিপূর্ণতা লাভ করে। ১ম শ্রেণি থেকে এমএ ক্লাস পর্যন্ত গোটা ব্যবস্থাই শিক্ষা। কিন্তু তাকে যদি ১ম শ্রেণিতেই এমএ ক্লাসের পড়া দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে শিক্ষার্থী সে ভার বইতে না পেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। শিক্ষার্থী যখন যে ক্লাসে পড়ে, তার মূল্যায়ন সেই ক্লাসের পাঠ্যক্রম অনুযায়ীই হয়।

পৃথিবীতে মানবজীবনের শুরু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যে ওহী শিক্ষায় মানুষ পরিচালিত হবে তার নাম ইসলাম। এর ১ম শ্রেণি শুরু হয়েছে

সর্বপ্রথম শিক্ষক নবী হযরত আদম (আ.) ও সেই সময়ের ওহীগ্রন্থের মাধ্যমে। আর এমএ বা পিএইচডি দিয়ে শেষ হবে সর্বশেষ শিক্ষক নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও এই সময়ে প্রেরিত ওহীগ্রন্থ কুরআনের মাধ্যমে। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত মানুষকে তাদের উপযোগী ওহীগ্রন্থই দেওয়া হয়েছে, আর কুরআনকে এর উপযোগী সময়েই প্রেরণ করা হয়েছে। কুরআনে ইসলামের যে সর্বশেষ পরিপূর্ণতা বা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ হয়েছে তা এর নাযিলকৃত সময়ের পূর্বেই পঠিয়ে দিলে মানুষ তা বুঝতে ও বহন করতে সক্ষম হত না। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে এই সিস্টেমের অধীন করে তৈরি করেছেন।

অন্যদিকে সময় যত যাবে, কুরআন বুঝা মানুষের পক্ষে কঠিন নয় বরং সহজ থেকে সহজতর হয়ে ওঠবে। আর আল্লাহ্ কুরআনকে এমনভাবে সাজিয়েছেন ফলে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের সকল চাহিদা এটি মেটাতে সক্ষম হবে। চিকিৎসক রোগীকে কিছু ঔষধ দিয়ে বলে থাকেন যে, ১, ২ ও ৩ নং ঔষধ পনের দিন পর্যন্ত চলবে, তার পরের পনের দিন চলবে ৪, ৫ ও ৬ নং ঔষধ। পনের দিন পর রোগীর শরীরের অবস্থা কী হবে তা চিকিৎসক এখনই জানেন বিধায় তার পক্ষে পনের দিন পরের চিকিৎসা-ব্যবস্থা পনের দিন পূর্বেই গ্রহণ করে রাখা সম্ভব হয়। তাহলে যিনি সকল সৃষ্টির স্রষ্টা, তিনি কি জানেন না যে কিয়ামত পর্যন্ত এই বিশ্বে কী কী ঘটবে আর কী কী ঘটবে না? তিনি সেগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানেন। তাই তিনি কুরআনে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের সকল প্রয়োজনসমূহের সব ব্যবস্থা বা মূলনীতি দিয়ে রেখেছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াবাসীর প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম।

শিরক ও পৌত্তলিকতা সবচেয়ে বড় পাপ ও সকল অনিষ্টের মূল

কোনো মানুষ, দেবতা, মূর্তি এক কথায় যেকোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে আল্লাহর ক্ষমতা ও গুণাবলির সমান ক্ষমতাসম্পন্ন বা অংশীদার মনে করাকে শিরক্ বলে। যারা শিরক্ করে তাদের দাবি যদি সত্য হত তাহলে কোনো কথা ছিল না। কিন্তু যারা শিরক্ করে তারা সবচেয়ে বড়

মিথ্যাবাদী। এরা মানুষ, দেবতা বা কোনো মূর্তির কাছে যাই কামনা করে না কেন, এটা তো সত্য যে এদের ভালো-মন্দ করার কোনো ক্ষমতা নেই। কাজেই জন্ম, মৃত্যু, রিজিক, সন্তান দেওয়া- প্রভৃতি সব কিছুর একমাত্র মালিক আল্লাহ্। তাই এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো সামনে মাতা নত করার অর্থ হল সর্বশক্তিমান আল্লাহর ক্ষমতাকে অপূর্ণ মনে করা।

আপনি আপনার স্ত্রীর ভরণপোষণ তথা যাবতীয় চাহিদা পূরণ করা সত্ত্বেও যদি আপনার স্ত্রী আপনার সঙ্গে আরো স্বামী শরিক রাখেন তাহলে আপনি কী করবেন? নিশ্চয় তাকে ত্যাগ করবেন। এখন একটু বিবেক খাটিয়ে চিন্তা করে দেখুন, আপনার স্ত্রীর প্রতি আপনার যে অনুগ্রহ, আল্লাহর অনুগ্রহ আপনার প্রতি তার চেয়ে কোটি কোটি গুণ বেশি যার কোনো মূল্য পরিশোধ করা সম্ভব নয়।

আপনি আপনার স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য যত বস্তুগত কিংবা অবস্তুগত বিষয় নিয়োজিত করেন তার কোনো কিছুরই স্রষ্টা আপনি নন। সবই আল্লাহর সৃষ্টি থেকে নিয়েছেন। অথচ এ সত্ত্বেও আপনার পক্ষে স্ত্রীর আচরণ সহ্য করা অসম্ভব। তাহলে যিনি আপনি এবং বিশ্বচরাচরের বস্তুগত-অবস্তুগত সবকিছুর স্রষ্টা ও মালিক তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক করলে তিনি তা কীভাবে মেনে নেবেন? মানুষ, দেবতা, মূর্তি এক কথায় আল্লাহ ছাড়া যেকোনো ব্যক্তি বা বস্তু- সবকিছুই আল্লাহর গোলাম। তাহলে নিজে আল্লাহর এক গোলাম বা দাস হয়ে আরেক গোলাম বা দাসের কাছে মাতা নত করা কি চরম নির্বুদ্ধিতা নয়? যে নিজেই আল্লাহর দাস, নিজেই অন্যের মুখাপেক্ষী, নিজে নিজেরই সমস্যার সমাধান করতে পারে না– সে কীভাবে আরেক দাসের সমস্যার সমাধান করবে? এজন্যই আল্লাহ কুরআনে বলেন:

“আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের পূজা করছো তারা সকলে মিলে একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না। সৃষ্টি করা তো দূরের কথা, মাছি যদি তাদের সামন থেকে কোনো কিছু ছিনিয়ে নেয় তাহলে তারা তা ফিরিয়ে আনতেও সক্ষম নয়। মাবুদ ও পূজারি উভয়ে দুর্বল। এরা আল্লাহর যথাযথ কদর করেনি– যিনি পরাক্রমশালী।” (হজ্জ: ৭৩-৭৪)

চিন্তা করে দেখুন, মূর্তিরই পূজারিকে পূজা করার কথা, যেহেতু পূজারি মূর্তিকে তৈরি করেছে। তাছাড়া মূর্তির চেয়ে তো পূজারির শক্তি-ক্ষমতা অনেক বেশি। অথচ, ঘটছে এর উল্টো! দেব-দেবীদের যদি সত্যি কোনো ক্ষমতা থাকত তাহলে দেখা যেত– এক ভক্ত পূজা-অর্চনা করে বৃষ্টির দেবতাকে খুশি করে ফেলেছে, বৃষ্টির দেবতা বৃষ্টি দিতে রাজি। এমন সময় বড় দেবতার হুকুম হল– বৃষ্টি হবে না। তখন ছোট দেবতারা হরতাল ডেকে বসতো। দেখা যেত– মানুষ বসে আছে সকালের প্রত্যাশায় কিন্তু সূর্য ওঠার কোনো খবর নেই, কারণ সূর্য-দেবতা বয়কট করে বসে আছেন। এ অবস্থায় গোটা মহাবিশ্ব-ব্যবস্থা তছনছ হয়ে যেত।

মূর্তিপূজাকে ইসলাম কঠোরভাবে ঘৃণা করে। কিন্তু কেন? সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, একদিকে আল্লাহকে না চেনা অন্যদিকে নিজেকে না চেনা– এই উভয়বিধ অজ্ঞতা থেকেই মূর্তিপূজা বা পৌত্তলিকতার চর্চা হয়। আল্লাহই সকল কিছুর মালিক ও দাতা– সর্বশক্তিমান। তিনি এককরূপে স্বাধীন, সার্বভৌম ও স্বয়ংসম্পূর্ণ– এই সহজ ও স্বাভাবিক সত্যোপলব্ধির অভাবই হচ্ছে পৌত্তলিকতা বা মূর্তিপূজার মূল। মানুষ যদি জানে যে, আল্লাহ এক, অদ্বিতীয় এবং সর্বশক্তিমান, যা কিছু চাইতে হয়, তাঁর কাছেই চাইতে হয়– তবে কেন সে আল্লাহকে ছেড়ে অপর কারো শরণাপন্ন হবে? আল্লাহকে সর্বশক্তিমান মানলে তবে কেন অন্যের পায়ে মাথা ঠুকতে হবে? আল্লাহ-মানা লোক কখনো মূর্তিপূজক বা পৌত্তলিক হতে পারে না।

মূর্তিপূজক বা পৌত্তলিক নিজেকেও চিনে না! নিজে কত বড় তা জানে না। আত্মবিস্মৃত রাজপুত্রের মতো দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা চেয়ে বেড়ায়। সে জানে না তার মধ্যে কী অসীম ও অনন্ত সম্ভাবনা লুকায়িত আছে। সে জানে না সে ছোট নয়, তুচ্ছ নয়– সে আল্লাহর প্রতিনিধি, সে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি– 'আশরাফুল মাখলুকাত'। সে জানে না তার জন্য এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ বড় নয়, অন্য কেউ সমস্যা নয়। চন্দ্র-সূর্য, মেঘ-বিদ্যুৎ, গিরি-নদী, মরু-প্রান্তর, জড়প্রকৃতি সমস্তই তার আয়ত্তাধীন– সকলেই তার সেবায় নিয়োজিত। সর্বশক্তিমান এক

আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের পূজা করা মানুষের নিজের এই মর্যাদাকে লাঞ্ছিত ও ধ্বংস করার নামান্তর।

যার সম্পর্ক যত বড় সম্মাননীয়ের সঙ্গে হয়, তার মর্যাদাও তত বৃদ্ধি পায়। অসীম অনন্ত ও বিরাটের সঙ্গে সম্মন্ধ স্থাপন না করলে কেমন করে মানুষ বড় হবে? সে তো মানুষই হতে পারবে না, বড় হওয়া বহু দূর। আল্লাহর চেয়ে বড় সম্মাননীয় কেউ নেই। তাই সর্বশক্তিমান এই সম্মাননীয়কে বাদ দিয়ে মূর্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা কী পরিমাণ বোকামি ও আত্মপ্রবঞ্চনা তা আমরা কবে বুঝব? একদিকে আল্লাহর সঠিক পরিচয় না জানা বা না মানা এবং অন্যদিকে নিজের প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা না জানা, নিজেকে ছোট ও তুচ্ছ বলে জানাই মূর্তিপূজা বা পৌত্তলিক মনোবৃত্তির দুই প্রধান উপাদান। আদীম মানুষের অজ্ঞতা থেকেই এই মূর্তিপূজা শুরু হয়েছিলো। কিছু মানুষ এখনো এই অজ্ঞতা থেকে বের হতে পারছেন না। মনে রাখুন, মূর্তিপূজা বা পৌত্তলিকতা সবচেয়ে বড় পাপ যার পরিণাম জাহান্নাম ছাড়া কিছু নয় যদি না এ থেকে ফিরে আসা হয়। একমাত্র সত্যধর্মই মানুষকে এসব জঞ্জাল থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারে, শান্তি দিতে পারে।

আদর্শ মহামানব

অনুসরণের জন্য ওহীর পাশাপাশি শিক্ষকের প্রয়োজন অনিবার্য যা আমরা পূর্বেই জেনেছি। কিন্তু জীবনে এই আদর্শ ব্যক্তি কে হবেন? এক্ষেত্রে নানা জন নানাভাবে তাদের মতামত প্রদান করার প্রয়াস পান। নানা জন নানা ব্যক্তিত্বকে তাঁর আদর্শ মানেন। সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল, গান্ধী, মাও সেতুং, মার্ক্স, নিউটন, আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল– একেকজনের আদর্শ ব্যক্তি একেকজন হয়ে থাকেন। এরকম মনীষীগণ নিঃসন্দেহে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য। তাঁরা প্রত্যেকেই মানবকল্যাণে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। তাঁদের অনেকের অনেক বা কোনো কোনো তত্ত্ব পৃথিবীতে সফল হয়নি, কারো কারো তত্ত্বের যৌক্তিক সমালোচনাও আছে। কিন্তু তাঁরা যে মানুষের কল্যাণ চেয়েছিলেন সে বিষয়ে বোধহয় কারো দ্বিমত

নেই। বিশ্বমানবের জন্য, নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষের জন্য তাঁদের হৃদয়ে যে দরদ, ব্যথা ও প্রেম-ভালবাসা ছিল তা আমাদেরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে। মানবতার বিন্দুমাত্র ক্ষতিও তাঁদের হৃদয় বরদাশত করতে প্রস্তুত ছিল না। তাঁরা সবাই শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু মানুষ হিসেবে তারা কেউই ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে ছিলেন না। এ কথা তো আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

জীবনের আদর্শ অনুসরণীয় ব্যক্তি হওয়ার জন্য একজন মানুষের কী কী গুণ থাকা অপরিহার্য তা অবশ্যই বিবেচনা করা প্রয়োজন। কারণ, আদর্শ অনুসরণীয় ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে এমন হবেন যিনি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অনুসরণযোগ্য হতে পারেন। আমরা জানি যে, 'আদর্শ অনুসরণযোগ্য' হবে সম্পূর্ণ আর এই অনুসরণযোগ্যতা হতে হবে সর্বজনীন। কিন্তু কোনো সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে, তা তিনি যতবড় বিজ্ঞানী, দার্শনিক, সাহিত্যিক বা রাজনীতিবিদই হন না কেন, এমন সর্বজনীন হওয়া কি সম্ভব? তলিয়ে দেখলে লক্ষ্য করব যে এটি সম্ভব নয়। এর কারণ হল একজন মানুষ, তিনি যতবড় বিজ্ঞানী বা দার্শনিকই হন না কেন, তার পক্ষে এটি অসম্ভব যে তিনি সকল দোষ-ত্রুটির ঊর্ধ্বে থাকতে পারেন। আর সকল শ্রেণির সকল মানুষের সর্বকালের সকল সমস্যার সমাধানের অনুসরণযোগ্যতা তার মধ্যে পাওয়া অসম্ভব। কারো মধ্যেই এই যোগ্যতা ও গুণ পাওয়া সম্ভব নয়।

কেন সম্ভব নয় তা একটু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কারণগুলো এভাবে বিন্যাস করা যেতে পারে: ১. একজন মানুষ, তিনি যতবড় বিজ্ঞানী, দার্শনিক, সাহিত্যিক বা রাজনীতিবিদই হন না কেন তাঁর অনুসরণের পক্ষে আল্লাহর কোনো নির্দেশনা বা মনোনয়ন নেই; ২. নবী-রাসূল ছাড়া কেউ গুনাহমুক্ত নয়; ৩. নবী-রাসূল ছাড়া কেউ পরকালীন মুক্তির কোনো আশা দিতে পারেন না; ৪. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কারো জীবনের বিন্দু-বিসর্গ সুসংরক্ষিত নেই যাতে যাবতীয় আদর্শ হতে পারেন ইত্যাদি। এসমস্ত গুণাবলি একমাত্র বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আছে যা ইতোপূর্বে প্রমাণিত হয়েছে।

আল্লাহর পর মানুষের মধ্যে একমাত্র নবীগণ হলেন একশভাগ সত্যবাদী। কারণ সাধারণ মানুষ কথা বলে নিজের জ্ঞান দ্বারা আর নবীগণ কথা বলেন স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে। ফলে মানুষের কথা সর্বদা সঠিক হবে এমনটা মনে করার সুযোগ নেই। কিন্তু নবী বলতে স্রষ্টা মনোনীত এমন একজন মহাপুরুষকে বুঝায় যার সকল কথা ও কাজ স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়ায় তাতে কোনো ত্রুটি থাকার ন্যূনতম সুযোগ নেই। কেন নেই? কারণ নবী হলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত মানবসমাজের জন্য রোল মডেল। এখন নবী থেকে ত্রুটি বা গোনাহ সংগঠিত হওয়ার অর্থ হল গোটা মানবসমাজের স্খলন হওয়া। এজন্য নবীদের ব্যাপারে এটি মহান ও পবিত্র আল্লাহর বিশেষ ব্যবস্থা যে স্বয়ং আল্লাহ্ নবীদেরকে যেকোনো প্রকার গোনাহ থেকে হেফাজত করেছেন। কিন্তু একমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কোনো নবীর জীবন-ইতিহাস সংরক্ষিত নেই; ইতিহাসের ধুলিধূসর থেকে তাঁদের সম্পর্কে যা উদ্ধার করা যায় বা গিয়েছে তার সত্যতা একদিকে প্রশ্নসাপেক্ষ, অন্যদিকে তা অতি অপর্যাপ্ত ও অস্পষ্ট। শুধু তাই নয়। যেমনঃ হযরত ঈসা আ.-এর জীবনে সকল মানুষের জন্য অনুসরণীয় পূর্ণাঙ্গ আদর্শ বা নমুনা পাওয়া যায় না। পরিবার, ব্যবসা, যুদ্ধ, রাষ্ট্রনায়ক প্রভৃতির আদর্শ পাওয়া যায় না এবং তিনি পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য প্রেরিতও ছিলেন না। তেমনিভাবে হযরত মুসা আ. কেবল বনি-ইসরাইল জাতির জন্য প্রেরিত ছিলেন এবং তাঁর জীবনে ব্যবসা, রাষ্ট্র পরিচালনা, যুদ্ধ প্রভৃতির আদর্শ পাওয়া যায় না।

একমাত্র মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিপূর্ণ জীবন ও কর্ম বিশ্ববাসীর সম্মুখে আকাশের মতোই উন্মুক্ত রয়েছে, কিছুই গোপনীয় নেই। তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবনের প্রতিটি বিন্দু-বিসর্গ সংরক্ষিত। তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবনচরিতের মতো উজ্জ্বল ও সংরক্ষিত দ্বিতীয় কোনো জীবনচরিত পৃথিবীতে নেই। তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিশু জীবন, কিশোর জীবন, যুবক জীবন, প্রৌঢ় জীবন, বৃদ্ধ জীবন, মৃত্যুকালীন জীবন- এর যাবতীয় ইতিহাস সুসংরক্ষিত।

চল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবুয়তপ্রাপ্ত হন। তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনেকে অস্বীকার করেছে, কিন্তু তাঁর চরিত্রে কোনো ত্রুটি ছিল এমনটি কেউ, কোনো ইতিহাসপণ্ডিতও অদ্যাবধি বলতে পারেন নি। তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে বিমোহিত হয়ে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিরুদ্ধবাদীরাই তাঁকে *আল্-আমিন* (বিশ্বাসী) উপাধি দিয়েছিল। তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শহরের লোকেরা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্যবাদিতার কসম করত। যারা তাঁর উপর ঈমান আনেনি, তারাই আবার তাদের টাকা-পয়সা তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখত। তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চরিত্র সম্পর্কে কুরআনে স্বয়ং আল্লাহ্ বলছেন: "নিঃসন্দেহে আপনি সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।" (ক্বালাম: ৪।) তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মতো প্রসংশিত দ্বিতীয় কোনো মানুষ পৃথিবীতে আসেন নি, আসবেনও না। মানুষ বুঝে না বুঝে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নাম স্মরণ করে, বলতে গেলে চব্বিশ ঘণ্টাই আজানের মাধ্যমে আল্লাহর নামের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামও স্মরিত হয়। তাইতো আল্লাহ বলছেন, "আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি।" (আল-ইনশিরাহ: ০৪) অমুসলিমরাও তাঁর প্রসংশা করে, আলোচনা করে।

তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভাই-বন্ধুরাই তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওপর সর্বপ্রথম ঈমান এনেছেন যারা তাঁকে ছোটবেলা থেকে দেখেছেন। স্ত্রীদের প্রতি মহানবীর নির্দেশ ছিল যে, তাঁরা যেন তাঁর সংসারজীবনের চিত্রও মানুষের সম্মুখে প্রকাশ করতে না ভুলে। পৃথিবীর কোনো মহামানবই এমন সাহস দেখাতে পারেন না যে তাঁর অন্দরমহলের একান্ত জীবন প্রকাশ্যে আসুক। তো এমন সর্বাঙ্গ সুন্দর সম্পূর্ণ প্রকাশিত নবী-জীবনই মানুষের জন্য মডেল হওয়ার যোগ্য। নবীজীর স্ত্রী হযরত আয়েশা রা নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চরিত্র সম্পর্কে একজনের জিজ্ঞাসার জবাবে বলেছিলেন, কুরআনই তোমাদের নবীর চরিত্র। অর্থাৎ, কুরআনে যা বলা হয়েছে তার আদর্শ মডেল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাস্তব

জীবন।

সেই কুরআনে মহান ও পবিত্র আল্লাহ মহানবীর চরিত্রের সার্টিফিকেট দিয়ে ঘোষণা করেছেন: "নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।" এই মহান চরিত্রের মানে হলো- তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্যায়ের বদলা অন্যায় দিয়ে নেন না। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্যায়কারীকে শুধু ক্ষমাই করেন নি বরং অন্যায়কারীর সঙ্গে এমন স্বর্গীয় আচরণ করেছেন যার ফলে সেই অন্যায়কারী-ই স্বয়ং স্বর্গীয় সোনার মানুষে পরিণত হয়ে গিয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ইহুদির কাছ থেকে কিছু ঋণ নিয়েছিলেন। তো সেই ইহুদি নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বেই এসে ঋণের জন্য চাপাচাপি শুরু করে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার বার একই কথা বলেন যে, আমার কাছে এখন দেওয়ার মতো কিছু নেই। কিন্তু ইহুদি মানছে না। এক পর্যায়ে মহানবীর গলায় ঝুলানো চাদর ধরে খুব অভদ্র আচরণ করে বসে। হযরত ওমর রা. মহানবীর সঙ্গে ছিলেন। তিনি ইহুদিকে ধমকিয়ে শাসাতে শুরু করেন। মহানবী হযরত ওমরকে থামিয়ে বললেন, হে ওমর! তোমার কাছে এটি আশা করিনি। কেননা লোকটির তো অর্থের প্রয়োজন। হে ওমর, তুমি বায়তুল মাল থেকে আপাতত আমার নামে ইহুদির ঋণটি পরিশোধ করে দাও। আমি পরে এটি বায়তুলমালে শোধ করে দেব। আর তুমি যে তাকে ধমক মেরেছ সেজন্য আরো বাড়তি দুইশত দেরহাম জরিমানাস্বরূপ তাকে (ইহুদিকে) দিবে। এই আচরণ দেখে ইহুদি বলে, আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থে মহানবীর এমন গুণাবলির বিবরণ আছে। আমি পরীক্ষা করার জন্য এমনটি করেছি। শেষে ঐ ইহুদি কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায়।

আর একটু ভেবে দেখুন, চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত এমন নিষ্কলঙ্ক চরিত্র যাঁর, জীবনে একটিও মিথ্যে কথা বলেন নি আর এখন নবুয়তী পেয়ে নবী হয়ে কি তিনি মিথ্যেবাদী হয়ে গেলেন? যে লোক জীবনে জাগতিক কোনো বিষয়ে একটিও মিথ্যে কথা বলেন নি, সেই তিনিই আল্লাহ্ ও ধর্ম সম্পর্কে মিথ্যে কথা বলবেন– এটি কি গ্রহণযোগ্য? তাঁর

বিরুদ্ধবাদীরা তাঁকে অর্থ-বিত্ত, নেতৃত্ব, সুন্দরী নারী- ইত্যাদি দেবে বলেছিল যদি তিনি তাঁর ধর্ম প্রচার থেকে বিরত থাকেন। জবাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানালেন– এসব কেন, আমার এক হাতে সূর্য আরেক হাতে চন্দ্র এনে দিলেও আমাকে কেউ সত্যধর্ম ইসলাম প্রচার থেকে বিরত রাখতে পারবে না। অদ্ভুদ যে, তাঁর বিরুদ্ধে আর কোনো অভিযোগ নেই, অভিযোগ কেবল একটি, তা হল– তিনি বলেন, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। অথচ এতো কোনো অভিনব কথা নয়, এতো পূর্ববর্তী সকল নবীগণই (আ.) বলে গেছেন। আসলে, এই বাক্য মেনে নিলে সম্মান, নেতৃত্ব, আর্থিক বিত্ত-বৈভব চলে যাবে বলে যারা আশংকা করতো, তারাই মূলত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর উপর ঈমান আনে নি। ফলে এই বিরোধিতা কোনো নতুন বিষয় ছিল না, এটি পূর্ববর্তী নবীগণের (আ.) ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর মাধ্যমে পৃথিবীতে ইসলামের যে বিপ্লব সাধিত হয়েছে তার গতি কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি, কখনও পারবেও না।

একটু চিন্তা করুন, জাগতিক কিছুই চান না, তাহলে কীসের জন্যে তিনি গোটা জীবন উৎসর্গ করে গেলেন? যার বিরুদ্ধে কোনো নেতিবাচক অভিযোগ প্রমাণ করা যায় না, কোনো দিন সম্ভবও নয়, তাঁকে মেনে না নেওয়ার পক্ষে আর কী যুক্তি থাকতে পারে? পায়ের নখ কাটা থেকে নিয়ে রাজ্য পরিচালনা পর্যন্ত জীবনের সকল বিষয়ের অভ্রান্ত দিক নির্দেশনা রয়েছে তাঁর জীবনচরিতে যা অন্য কারো জীবনে পাওয়া যায় না। সবচেয়ে বড় কথা তিনি আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল; সুতরাং একমাত্র তাঁর অনুসরণ ছাড়া আল্লাহর আনুগত্য হতেই পারে না। আর আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া কোনো মুক্তি নেই। সুতরাং আল্লাহর আনুগত্য করতে হলে তথা শান্তি ও মুক্তি পেতে হলে এই নবীর অনুসরণের কোনো বিকল্প নেই।

কবি গোলাম মুস্তফা তাঁর বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গ্রন্থে এ বিষয়ে প্রামাণ্য আলোচনা করেছেন। তিনি একটি বাস্তবসম্মত বিচারবিন্দুতে জগতের সকল মনীষী ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে মূল্যায়নের আহ্বান করেছেন। তাঁর বিচারবিন্দুকে ভিত্তি করে নিম্নোক্ত বিচারবিন্দুটি (সারণি: ১) এ উদ্দেশ্যে প্রণীত হলো। আমরা দেখতে পারি যে সর্বকালের সর্বজনীন আদর্শ হওয়ার জন্য এই বিচারবিন্দুতে কে উত্তীর্ণ হতে পারেন?

সারণি : ১ সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ পরিমাপ বিচারবিন্দু

১. জন্ম-মৃত্যুর সঠিক তারিখ, বংশ পরিচয় এবং সমগ্র জীবনের সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক বিবরণ আছে কি না
২. মানবীয় উপাদান কতখানি আছে; অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র পরিজন নিয়ে ঘর-সংসার করেছেন কি না, সামাজিক, নাগরিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনের কোনো আদর্শ রেখে গেছেন কি না
৩. মানব জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে গেছেন কি না
৪. সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে কিরূপ ব্যবহার করেছেন
৫. জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত মানব জীবনের খুঁটিনাটি প্রত্যেক কার্যের আদর্শ বা বিধান দিয়ে গেছেন কি না
৬. সততা, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়-নীতি, স্নেহ-মমতা, প্রেম-প্রীতি, দয়া-মায়া, ক্ষমা, ত্যাগ, সেবা, সংযম, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, উদারতা, সৎসাহস, নির্ভীকতা, মানবপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা, বিশ্বমানবতা- প্রভৃতি মহৎ গুণাবলির কী কী পরিচয় রেখে গেছেন
৭. আপন ধর্মমত প্রচার করার জন্য কতখানি ত্যাগ স্বীকার ও বিপদ বরণ করেছেন
৮. আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উৎকর্ষ কার কতখানি হয়েছিল
৯. কোনো ওহি লাভ করেছিলেন কি না এবং তা অদ্যাবধি অবিকৃত আছে কি না
১০. শিষ্যদের উপর কে কতখানি প্রভাব সৃষ্ঠি করতে পেরেছিলেন; শিষ্যরাইবা কতখানি গুরুভক্তি ও ধর্মনিষ্ঠা দেখাতে পেরেছেন
১১. কার ধর্মবিধান বা আদর্শ বিশ্বমানবতার উপর সর্বাপেক্ষা কার্যকরী হয়েছে, অথবা বিশ্বজনীন আবেদন কোন ধর্মে অধিক আছে
১২. যুগসমস্যার সমাধানকল্পে কে কতখানি সহায়ক
১৩. ধর্ম ও কর্মের কিংবা ইহ-পরকালের সুসমন্বিত ভারসাম্যপূর্ণ মিলিত আদর্শ তাঁর মধ্যে পাওয়া যায় কি না
১৪. জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক নর-নারী তাঁর মধ্যে জীবনের আদর্শ খুঁজে পায় কি না, অন্য কথায় বিশ্বমানবের তিনি সর্বোত্তম পথ-প্রদর্শক কি না
১৫. বহির্জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার গুণ কার ধর্মে কত বেশি
১৬. কার ধর্ম কত উদার ও কত ব্যবহার উপযোগী
১৭. জ্ঞান-সভ্যতায় কোন ধর্মের দান কতখানি
১৮. ইহ-পরকালের ব্যাপক পরিচয় কোন ধর্মে আছে

১৯. মানুষের অপরিসীম শক্তি ও সম্ভাবনার বাণী অধিক পরিমাণে কে মানবজাতিকে দান করেছেন

সৃষ্টির আদিকাল থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকল মহামানবকে আমরা এভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি। তুলনায় তাঁরা কেউই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমকক্ষ ছিলেন না, শ্রেষ্ঠ তো নয়ই। বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ, রাম, জড়োথুস্ট্র, মুসা, ঈসা- এক কথায় কার জীবনে এমন সর্ববিষয়ের সামগ্রিক জীবনাদর্শ পাওয়া যায়? না, পাওয়া যায় না। তাঁদের জীবন-ইতিহাসই পাওয়া যায় না, যতটুকু জানা যায় তা-ই সত্য সত্য ঘটেছিল এরও কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই যেমনটি নবী মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আছে। শুধু কি তাই? মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অসংখ্য শিষ্যদেরও পর্যন্ত জীনব-ইতিহাস সুসংরক্ষিত আছে।

মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গোটা জীবন গোটা বিশ্বজগতের প্রতিনিধিত্ব করেছে এবং করছে। ধূলার ধরণী হতে খোদার আরশ পর্যন্ত ছিল তাঁর কর্মভূমি। তাঁর মধ্যে সকলেই আদর্শ খুঁজে পেতে পারে। একদিকে তিনি রাখাল বেশে মাঠে মাঠে মেষ চড়াচ্ছেন অপরদিকে সম্রাট বেশে রাজ্য পরিচালনা করছেন। একদিকে শ্রমিক সেজে মাটি কাটছেন, শ্রমের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব রচনা করছেন অপরদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন, দেশ-দেশান্তরে যাচ্ছেন, সেবাসংঘ গঠন করে আর্তপীড়িতের সেবা করছেন। একদিকে রাষ্ট্রপতি বেশে রাজনীতি, দেশ শাসন ও জনকল্যাণের আদর্শ দেখিয়ে যাচ্ছেন, অন্যদিকে কুড়ে ঘরে বসে সম্পদ ও ক্ষমতার প্রতি আচরণের নমুনা দেখিয়ে যাচ্ছেন। একদিকে বিবাহ করে সংসার পেতেছেন, স্বামী, পিতা ও প্রতিবেশীর কর্তব্য পালন করছেন, দুনিয়াবি মানবীয় জীবনযাপন করছেন। একাধিক বিয়ের মাধ্যমে শত্রুকে বন্ধুতে পরিণত করা, স্ত্রীদের মাধ্যমে নারীসমাজের মধ্যে দ্বীন প্রচার করানো, একাধিক বিয়ে অবশ্যম্ভাবী হলে একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে আচরণের আদর্শ এবং স্ত্রী কুমারী, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, নওমুসলিম হলে এই বিচিত্র ঘরানার বিচিত্র আবেগ-অনুভূতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা অনুপাতে আচরণের আদর্শ দেখিয়ে যাচ্ছেন।

অপরদিকে নিভৃত গিরিগুহায় বসে কঠোর সাধনায় মগ্ন রয়েছেন, রোযা রেখে পেটে পাথর বেঁধে দিন কাটাচ্ছেন, রাতে জায়নামাজে প্রভুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। একদিকে পাশবিক নির্যাতন-নিপীড়নের মুখে ধৈর্য ও সবর অবলম্বন করছেন, হিজরত করে অত্যাচারীদিগের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন অপরদিকে যালিমকে বাধা দিয়ে, বাতিলের সম্মুখে দুর্বার গতিতে দাঁড়িয়ে মিথ্যার দমন ও সত্যের লালনের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করছেন। একদিকে সেনাপতি বেশে বীরের মতো যুদ্ধ করে মিথ্যার বিলোপ সাধন করছেন অন্যদিকে পরম শত্রুকে ক্ষমা করে বক্ষে স্থান দিচ্ছেন। একদিকে সঞ্চয় করছেন অন্যদিকে মানবকল্যাণে সর্বস্ব বিলিয়ে দিচ্ছেন। একদিকে দুনিয়ার খবর রাখছেন অন্যদিকে অসীম রহস্যালোকে প্রবেশ করে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলছেন।

বস্তুত, ধনী-গরিব, শ্রমজীবী, ব্যবসায়ী, দাস-দাসী, পিতা-পুত্র, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, গৃহী, প্রতিবেশী, নাগরিক, কর্মী, জ্ঞানী, স্বদেশী-বিদেশী, যোদ্ধা-সেনাপতি, শত্রু-মিত্র, রাজা-প্রজা, জিন-ফেরেশতা, গওস-কুতুব, ফকীর-দরবেশ, মুসাফির, শিক্ষক-ছাত্র, নেতা, নবী-রাসূল সকলের জন্য তিনিই সর্বোত্তম আদর্শ।

শুধু তাই নয়। যদি এমন হয়, যেকোনো বিষয়ে মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবনে অনুসরণীয় নমুনা পাওয়া যাচ্ছে না, যেমন গুনাহ হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনার নমুনা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে পাওয়া যাবে না। কারণ পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে নবী-রাসূলগণ আল্লাহ কর্তৃক যে কোনো গুনাহ থেকে মুক্ত বা মাসূম। তাহলে এক্ষেত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ হলো- সেটি তোমরা আমার কোনো না কোনো শিষ্যের মধ্যে খুঁজো এবং পেয়ে যাবে। সেখান থেকে তা গ্রহণ কর- তা গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃত। এমন দৃষ্টান্ত অন্য কোনো ধর্মে আমরা খোঁজে পাইনি।

কবি গোলাম মোস্তফা লেখেন, শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হল সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের ধারণা। এসব গুণে যে যতখানি অগ্রগণ্য সে ততখানি শ্রেষ্ঠ

বলে বিবেচিত হয়। এককথায় বলা যায়, যত প্রকারের জ্ঞান, গুণ ও যোগ্যতা আছে সেসবে যে যত পরিপূর্ণ সে তত বেশি শ্রেষ্ঠ। কিন্তু মানুষের মধ্যে শতভাগ পরিপূর্ণতা সম্ভব নয়। পরমপূর্ণ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ হতে পারে না। তাই আল্লাহই আমাদের একমাত্র শ্রেষ্ঠত্বের ধ্রুব আদর্শ। এখন মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব এই আদর্শের পাশে রেখে বিচার করতে পারি। মানুষের মধ্যে যে-ই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করেন না কেন তাকে আল্লাহর গুণাবলি আয়ত্ব করতে হবে। এ ছাড়া শ্রেষ্ঠত্বের অন্য কোনো আদর্শ উপায় নেই। অতএব আল্লাহর গুণাবলি যে সবচেয়ে বেশি আয়ত্ব করেছেন তিনিই মানবজাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পরিগণিত হবেন, এটিই স্বাভাবিক। এজন্যই এক হাদিসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা আল্লাহর গুণাবলিতে গুণান্বিত হও। আমরা লক্ষ্য করি যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই এসব মাপকাঠিতে মানবজাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হন। এই শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের বিচারে নির্দিষ্ট হয়নি বরং খোদ মহান আল্লাহই এর সাক্ষ্য দিচ্ছেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কুরআনের নিচের বাণীগুলো লক্ষ্য করুন:

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে সর্বোত্তম নমুনা রয়েছে। (আহ্‌যাব: ২১) আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। (কলম: ৪) বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। (আল-ইমরান: ৩১)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে:

তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। এ (কুরআন) হল ওহি, যা (তাঁর প্রতি) প্রত্যাদেশ হয়। (নজম: ৩-৪) মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন বরং তিনি আল্লাহর রাসুল এবং সর্বশেষ নবী। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। (আহ্‌যাব: ৪০) আমি আপনাকে সমগ্র

মানবজাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (সাবা: ২৮) বলুন, হে মানবমণ্ডলি, আমি গোটা পৃথিবীবাসীর জন্য রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি। (আরাফ: ১৫৮) আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। (মায়েদা: ৩)

মানুষের তিনটি মৌলিক সম্মন্ধ রয়েছে– আল্লাহর সঙ্গে সম্মন্ধ, মানুষের সঙ্গে সম্মন্ধ, বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে সম্মন্ধ। তিনদিকেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মন্ধ পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। কর্মজীবনে, ধর্মজীবনে, ইহজীবনে, পরজীবনে, দৈহিক জীবনে, অধ্যাত্মিক জীবনে, নাগরিক জীবনে, পারিবারিক জীবনে, নৈতিক জীবনে, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক জীবনে, সংস্কার সাধনে, জাতি গঠনে, রাষ্ট্র গঠনে, জ্ঞানে, পুণ্যে, প্রেমে, বীরত্বে, ক্ষমায়, সৎসাহসে, সংযমে, ত্যাগে, মুক্তি-সংগ্রামে, স্বাবলম্বনে, সততায়, সত্যবাদিতায়, ন্যায় ও উদারতায়– যেকোনো দিক দিয়ে এমন পরিপূর্ণ আদর্শ আর কেউ নেই। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমি চরিত্রের পরিপূর্ণতা বিধানের জন্য এসেছি।” তাইতো আল্লাহ বলেন: যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর মধ্যে সর্বোত্তম নমুনা রয়েছে।

পবিত্র কুরআনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুটি মোবারক নাম ‘মুহাম্মদ’ ও ‘আহমদ’ উল্লিখিত হয়েছে যার অর্থ যথাক্রমে প্রসংশিত ও প্রসংশাকারী। সর্বাধিক প্রসংশিত তিনিই হন যিনি সর্বার্থে সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ আদর্শ। অন্যদিকে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হবেন তিনি মহান ও পবিত্র রবেরও সর্বাধিক প্রসংশাকারী হবেন। পবিত্র কুরআনে লক্ষ্য করা যায় যে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে খোদ আল্লাহই তাঁকে সর্বাধিক প্রসংশিত তথা মুহাম্মদ বলে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান ও পবিত্র আল্লাহর যে পরিচয় ও প্রসংশা বর্ণনা করেছেন তা অন্য

যে কারো চেয়ে, অন্য যেকোনো ধর্মের চেয়ে অধিক প্রসস্ত ও স্বার্থক হয়েছে। এজন্যই খোদ আল্লাহই তাঁকে সর্বাধিক প্রসংশাকারী তথা আহমদ বলে অভিহিত করেছেন।

সুতরাং যে অর্থেই দেখি না কেন, ইহ-পরকালের শান্তি ও মুক্তির জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই মানবজাতি ও তার সভ্যতার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ অনুসরণীয় আদর্শ, চিরকালীন একমাত্র বিকল্পহীন আদর্শ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে তো নয়, পরেও এমন কোনো মহামানব জন্ম গ্রহণ করেন নি যিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমকক্ষ হতে পারেন, শ্রেষ্ঠত্বের তো প্রশ্নই উঠে না। তা সত্ত্বেও, ভবিষ্যতের পানে কেবল সংশয়বাদীরাই অপেক্ষায় থাকতে পারেন!

শেষ কথা: ইসলাম ছাড়া মুক্তি নেই

প্রিয় পাঠক, আপনি সত্যধর্ম পালন করুন বা নাই করুন– স্রষ্টার তাতে কিছুই যায়-আসে না। অন্যেরও কিছু যায় আসে না। কিন্তু আপনার যায়-আসে। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, আপনার অনুসৃত পথ যদি ভ্রান্ত হয়, হতেই পারে, তাহলে মৃত্যুর পর চির-জাহান্নামী হতে হবে– এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ধর্মে বিশ্বাসী যেকোনো বুদ্ধিমান মানুষের তাই উচিত হবে এ বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে অনুসন্ধান করা। রাষ্ট্রে বসবাস করে যদি রাষ্ট্রের আইন না মানা হয় তাহলে সেটা রাষ্ট্রদোহিতাই বটে। তেমনি আল্লাহর পৃথিবীতে বাস করে, তাঁর সকল নিয়ামত ভোগ করে কেউ যদি আল্লাহর বিধান না মানে তাহলে এটাও সুস্পষ্ট আল্লাহদ্রোহিতা। এমন লোকের এ দুনিয়াতে অবস্থান করার কোনো অধিকার থাকে না। তাই আমাদের উচিত আল্লাহর এই বিধানকে খুঁজে নিয়ে সে মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা। এই বিধান হল 'ইসলাম'। জীবন পরিচালনার সর্বাঙ্গীন রীতি-নীতি আপনি ইসলাম ছাড়া আর কোনো তন্ত্র-মন্ত্রে পাবেন না। যত যুক্তিতর্কই দেখান না কেন, ইসলাম ছাড়া কোনো মুক্তি নেই।

ইসলাম ও ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে

প্রতিটি ধর্মগ্রন্থে এতো স্পষ্ট উল্লেখ থাকার পরও যদি কেউ ভ্রান্ত পথে জীবন পার করে দেন তাহলে সেটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক। নিজের সর্ববৃহৎ স্বার্থে এ বিষয়ে তাই সবচেয়ে যত্নবান হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অন্তর কখনো মিথ্যার উপর স্থায়ী হয় না, সেটা সত্যের মধ্যেই স্থায়ীত্ব লাভ করে। আপনি যদি কুরআন-হাদিস পড়েন, ইসলাম সম্পর্কে জানেন, তাতে আপনার কোনো ক্ষতি হওয়ার ন্যূনতম সম্ভাবনাও নেই। কেননা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেবল মুসলমানদের জন্য পাঠানো হয়নি, পাঠানো হয়েছে সকল দেশের সকল মানুষের জন্য। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর হাদিসেই পাবেন এ কথা। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর আদর্শ আপনার দরজায় দণ্ডায়মান– শুধুমাত্র একটু জানার চেষ্টা করুন। মহান ও পবিত্র স্রষ্টা আমাদের সকলকে সত্য বুঝার ক্ষমতা দান করুন, আমীন (কবুল করুন)।

আজকের ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জীবনের দিকে তাকিয়ে ইসলামকে বুঝার চেষ্টা করা ঠিক নয়। কারণ, কোনো মুসলিম ইসলামের যথার্থ অনুসরণকারী না হলে যেমনটি আজকাল বেশিরভাগক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সেটি তার নিজের ব্যর্থতা, এটি ইসলামের ব্যর্থতা নয়। সত্যধর্ম ইসলাম ইসলামই যাকে সেই ধর্মের মূল গ্রন্থ কুরআন ও হাদিস দিয়ে বিচার করতে হবে। আর কোনো মানুষকে দিয়ে ইসলামকে বিচার করতে হলে সেটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়ে বিচার করতে হবে। এজন্য তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সীরাত বা জীবনচরিত অধ্যয়ন করা উচিত।

নিচে পবিত্র কুরআনের প্রথম সূরা- সূরা ফাতেহার বাংলা অনুবাদ তুলে দেওয়া হলো। এই সূরা গোটা কুরআনের সার-নির্যাস। যার প্রতিউত্তর হলো গোটা কুরআন। আমরা এই গ্রন্থের শুরুতে একটি শব্দ উল্লেখ করেছিলাম। সেটি ছিল- হেদায়াত। হেদায়াতের অর্থ হলো- আল্লাহর নির্ধারিত বিধান বা পথ লাভ করা। এই হেদায়াত যার লাভ

হয়েছে তিনি ইহ-পরকালে সফল, সৌভাগ্যবান। এটি-ই মহা-সাফল্য। আর এই হেদায়াত যার লাভ হয়নি তিনি ইহ-পরকালে বিফল, দুর্ভাগা। এরা-ই চিরকাল জাহান্নামের আগুণে জ্বলবে। দুনিয়াতে এদের অর্থ-বিত্ত আসলে শাস্তি ও ধোঁকা যা এরা বুঝতে পারে না। সুতরাং, একজন মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো এই হেদায়াত, অর্থাৎ একমাত্র সত্যধর্মের অনুসারী হওয়া। এজন্য মহা প্রজ্ঞাবান আল্লাহ কুরআনের শুরুতে সূরা ফাতেহার মাধ্যমে এই মূল দৌলতের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে শিক্ষা দিয়েছেন। আর তখন, মহান ও পবিত্র আল্লাহ প্রতিউত্তরে এই হেদায়াতের যাবতীয় বিধিব্যবস্থার মূলনীতি সবিস্তারে গোটা কুরআনে খুলে খুলে বর্ণনা করে দিয়েছেন।

সূরা ফাতেহার বঙ্গানুবাদ

শুরু করছি আল্লাহর নামে; যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু

"সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। তাদের পথ যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ করেছ। তাদের পথ নয় যাদের ওপর তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।"

সকল ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে মিলান, তুলনা করুন এবং ভাবুন।

পরিশেষে আসুন, মনে মনে সৃষ্টিকর্তার কাছে বলি- হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সত্যপথ দেখান। ব্যাস দেখবেন, আপনার-আমার কপাল খুলে যাবে। কারণ, যে সত্যপথের অন্বেষণ করে, মহামহিম প্রভুর করুণায় সে তা পেয়ে যায়, ইন শা আল্লাহ।

গ্রন্থপঞ্জি

পাঠকদের কথা ভেবে নিম্নের গ্রন্থপঞ্জি সংযুক্ত করা হল।

১. আফজাল চৌধুরী অনু.। *বার্ণাবাসের বাইবেল*। ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি। ২০১১।
২. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা রহ.। *আলোর কাফেলা সমগ্র*। নাসীম আরাফাত ও মাসউদুয যামান অনু. ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ। ২০১৩।
৩. আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কীরানবী রহ.। *ইযহারুল হক*। খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর অনু. ঢাকা: ইফা। ২০০৭।
৪. ইসলামিক ফাউন্ডেশন। *আল-কুরআনে বিজ্ঞান*। ঢাকা: ইফা। ২০১২।
৫. ক্ষিতিমোহন সেন। *হিন্দু ধর্ম*। কলিকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স। ২০০৮।
৬. গোলাম মোস্তফা। *বিশ্বনবী*। ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাইজ। ২০১৩।
৭. এ. এইচ. বিদ্যার্থী ও ইউ. আলী। সোমমৌলি অধিকারী ও সিদ্ধার্থ মজুমদার অনুদিত, *পারসি, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)*। কলকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স।
৮. বেদপ্রকাশ উপাধ্যায়। *বেদ-পুরাণে আল্লাহ ও হযরত মুহাম্মদ*। ঢাকা: ইসলামী সাহিত্য প্রকাশনালয়। ২০২৩।
৯. বেদপ্রকাশ উপাধ্যায়। *কল্কি অবতার ও মুহাম্মদ সাহেব*। ঢাকা: ইসলামী সাহিত্য প্রকাশনালয়। ২০২৩।
১০. বিবিএস। *ইঞ্জিল শরিফ*। ঢাকা। ১৯৮০।
১১. মরিস বুকাইলি। *বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান*। অনু. আখ্‌তার-উল্‌-আলম। ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী। ১৯৯৬।
১২. মরিস বুকাইলি। *মানুষের আদি উৎস*। অনু. আখ্‌তার-উল্‌-আলম। ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী। ১৯৯৬।
১৩. মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.। *যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা*। ঢাকা: গাওসিয়া পাবলিকেশন্স। ২০২১।
১৪. মুসতফা আস সিবাঈ। *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*। আকরাম ফারুক অনু. ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার। ২০১০।
১৫. মুহাম্মদ শফি রহ.। *তফসীরে মা'আরেফুল-কুরআন*। মাওলানা মহিউদ্দিন খান অনু.। ঢাকা: ইফা। ২০১২।
১৬. মুহাম্মদ হাকিম চুগতাই। *সুন্নতে রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান*। ঢাকা: মীনা বুক

হাউজ। ২০১০।
১৭. মুহাম্মদ তকী উসমানী। মুহাম্মদ তৈয়্যেব হোসাইন অনু. *ইসলামি জীবন-ব্যবস্থা*। ঢাকা: বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স। ২০১৪।
১৮. মুহাম্মদ তকী উসমানী। *খৃষ্টধর্মের স্বরূপ*। ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ। ২০১১।
১৯. মুহাম্মদ তকী উসমানী। *পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্র ও ইসলাম*। ঢাকা: মাকতাবাতুল আযহার। ২০১৫।
২০. মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল। *মহানবীর (সা.) জীবন চরিত*। আবদুল আউয়াল অনু. ঢাকা: ইফা। ২০১০।
২১. মুরতাহিন বিল্লাহ জাসির ফাযলি। *হিন্দুধর্ম ও ইসলাম জানা-অজানা কথা*। ঢাকা: দারুল আরকাম পাবলিকেশন্স। ২০১২।
২২. মুহাম্মদ নূরুল আমীন। *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*। ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন। ২০০৬।
২৩. মোহাম্মদ শামীম খান। *মুসলিম উম্মাহর জেগে উঠার প্রতীক্ষায়*। সিলেট: খানক্বায়ে আমিনিয়া আসগরিয়া। ২০২০।
২৪. রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ অবলম্বনে। *ঋগ্বেদ-সংহিতা*। ১ম ও ২য় খণ্ড। কলকাতা: হরফ। ১৩৮৩।
২৫. নূরুল হোসেন খন্দখার। *বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম অবদান*। ঢাকা: ইফা। ২০০৯।
২৬. শাঈখ হাসান মাহফুজ। *আল-কুরআন সহজ ভাবানুবাদ*। ঢাকা: সার্কেল অব কুরআন। ২০২৩।
২৭. শেখ মুহাম্মদ আব্দুল হাই। *সত্যের সন্ধানে*। ঢাকা: মদিনা পাবলিকেশন্স। ১৯৯৫।
২৮. শেখ মুহাম্মদ আব্দুল হাই। *খ্রিস্টান-মুসলিম সংলাপ*। ঢাকা: দাওয়াহ প্রকাশন। ১৯৯৫।
২৯. শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী অনু.। *যজুর্বেদ-সংহিতা*। কলকাতা: হরফ। ২০০০।
৩০. শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী অনু.। *অথর্ববেদ-সংহিতা*। কলকাতা: হরফ। ২০০০।
৩১. শ্রীপরিতোষ ঠাকুর অনু.। *সামবেদ-সংহিতা*। কলকাতা: হরফ। ২০০১।
৩২. সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। *মুসলিম উম্মাহর পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হল?* অনু. আবু তাহের মেছবাহ। ঢাকা: দারুল কলম। ২০১৩।
৩৩. সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। *মহানবী (সঃ) ও সভ্য পৃথিবীর ঋণ*

স্বীকার। ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ। ২০০৪।
৩৪. সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। *ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান*। আ ফ ম খালিদ হোসেন অনু. ঢাকা: মুহাম্মদ ব্রাদার্স। ২০০৪।
৩৫. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। *উপনিষদ*। প্রথম ভাগ। কলকাতা: আনন্দ। ২০০৫।
৩৬. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। *উপনিষদ*। দ্বিতীয় ভাগ। কলকাতা: আনন্দ। ২০০৪।
৩৭. John William Drapar. *History of the Conflict between Religion and Science*. New York: D. Apleton & Company. 1875.
৩৮. Karen Armstrong. *Jerusalem One City, Three Faiths*. New York: Random House Inc. 2005.
৩৯. Halide Edib. *Conflict of East and West in Turkey*. Delhi: Jamia Millia Islamia. 1935.
৪০. H.G. Wells. *A Short History of the World. World Public Library*. 2010.
৪১. Historian's History of the World.
৪২. Brooks Adams. *The Law of Civilization and Decay*. London. 1889.
৪৩. Maurice Bucaille. *The Bible, The Qur'an and Science*. Translated from French by Alastair D. Pannell and The Author.
৪৪. M. H. Hart. *The 100*. Kuala Lumpur: Golden Books Centre SDN, BHD. 2000.
৪৫. Mohammad Asad. *Islam at the Cross-Road*. Dar Al-Andalus, Gibraltar.
৪৬. Robert Briffault. *The Making of Humanity.* London: George Allen & Unwin Ltd. 1919.
৪৭. Stanley Lane-poole. *Saladin*. London: G.P.Putnams Son. 1898.
৪৮. W. E. H. Lecky. *History of European Morals*. New York: Longmans, Green and Co. 1913.
৪৯. Will Durant. *Our Oriental Heritage*. New York: Grove Press. 1963.
৫০. Will Durant. *The Story of Civilization*. Vol. 1. New York: Simon & Schuster. 1942.

ড. মোহাম্মদ শামীম খান

জন্ম: ১৯৭৪, সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার হামিদপুর গ্রামে। বর্তমান নিবাস একই উপজেলার গোরারগাঁও গ্রামে। পিতা আজর খান ও মাতা রচনা বেগমের দ্বিতীয় সন্তান। পড়ালেখা করেছেন: গোরারগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গনেশ্বরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, এরালিয়া বাজার উচ্চবিদ্যালয়, বিশ্বনাথ কলেজ। উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন: শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, আইবিএস- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়, মালয়েশিয়া। ২২-তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ২০০৩ সালে শিক্ষা ক্যাডারে যোগদান করেন। ড. খান একজন অধ্যাপক ও শিক্ষক-প্রশিক্ষক। অধ্যাপনার পাশাপাশি গবেষণা ও লেখালেখি তাঁর প্রধান আগ্রহ।

প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ- *মুসলিম উম্মাহর জেগে উঠার প্রতীক্ষায়* যা প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠাসম্বলিত একটি গবেষণামূলক রেফারেন্স গ্রন্থ। চিরশান্তির পথ লেখকের দ্বিতীয় গ্রন্থ। তাঁর বেশ কিছু গবেষণা প্রবন্ধ বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তার কিছু হল-

"Investigation on Absenteeism among Undergraduate Students: A Study at a Government College in Bangladesh." Published in the *International Journal on All Research Education & Scientific Methods.* Vol. 9, Issue. 2, February 2021. Impact Factor: 7.429. Available in online at: www.ijaresm.com

“Economic Exploitation of the Urban Working Children: Violation of Human Rights.” Published in Journal of the Institute of Bangladesh Studies (JIBS), University of Rajshahi, Bangladesh. Vol. XXX1 2008. (ISSN 0256)

“Environmental Hazards to Working Children in Rajshahi Metropolitan City.” Published in the Bangladesh Journal of Environmental Science, Bangladesh Association for Environmental Development, Bangladesh Agricultural

University, Mymensingh. Vol. 14, No. 1, June 2008. (ISSN 1561)

"The Origin of Manipuris and Their Religious Beliefs Today." Published in the Annual Review of Ethnic Affairs. Ethnic Community Development Bangladesh (ECDB), Sylhet, Bangladesh, Vol. IV, August 9 2008. (ISSN 1999)

"Impact of Physical Abuse on the Health of the Working Children in a City of Bangladesh," International Journal of Cross Cultural Studies, New Delhi, India.

"Manipuri Literature: A Less Known Episode." Published in the Annual Review of Ethnic Affairs. Ethnic Community Development Bangladesh (ECDB), Sylhet, Bangladesh, Vol. V, August 9 2009. (ISSN 1999)

"Profession of Social Work and Its Practice in Bangladesh: Some Recommendations." presented in The International Conference on Social Work & Sustainable Social Development; organized by Department of Social Work, SUST, Bangladesh, 4-6 January 2018. Published.

কওমি মাদরাসার জন্য লিখেছেন পাঠ্যবই- *পরিবেশ ও সমাজ পরিচিতি* (৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণি); আযাদ দ্বীনী এদারায়ে তালীম বাংলাদেশ (কওমি মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড, সিলেট বিভাগ) কর্তৃক ২০১৫ সাল থেকে মাদরাসায় পঠিত হয়ে আসছে। সম্পাদিত পাঠ্যবই: *উচ্চ মাধ্যমিক সমাজকর্ম* ১ম ও ২য় পত্র, কাজল ব্রাদার্স লি.।

বিভিন্ন স্থানীয়, জাতীয় পত্রিকা, ম্যাগাজিনে লেখকের প্রায় অর্ধশতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কিছু উল্লেখ- ১. নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন প্রজন্মের প্রত্যাশা: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত। (দৈনিক সিলেটের ডাক, ৩ মার্চ, ২০০৯; এথিক্স ক্লাব বাংলাদেশ কর্তৃক পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবন্ধ), ২. সোনার বাংলা তত্ত্ব। দৈনিক উত্তরপূর্ব পাঠকমঞ্চ, ৩ নভেম্বর ২০১১; ফেরারী, দ্বিমাসিক সাহিত্য পত্রিকা, ১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা ডিসেম্বর-জানুয়ারি ২০১১-২০১২, আরিয়াল পাবলিকেশন্স, মনট্রিল ও ঢাকা), ৩. সুশিক্ষক এবং

সামাজিক দায়বদ্ধতা। (দৈনিক সিলেটের ডাক, ১৪ জানুয়ারি ২০০৯; নায়েম, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত 'সুশিক্ষক এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা' শীর্ষক সেমিনারে পঠিত মূল প্রবন্ধ), ৪. বঙ্গবন্ধু, আমাদেরকে ভুল বুঝ না, আমরা তোমাকে ঠিকই ভালবাসি (দৈনিক সিলেটের ডাক, ২২ নভেম্বর ২০০৯), ৫. নতুন প্রজন্মকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে (দৈনিক সিলেটের ডাক, তারিখ অসংরক্ষিত), ৬. স্বাধীনতা ও মুক্তি: সংকল্প ও বাস্তবতা (দৈনিক সিলেটের ডাক, এপ্রিল ২০১০), ৭. ১৬ ডিসেম্বর: বিজয় প্রতিনিয়ত যে বারতা দেয় (দৈনিক সিলেটের ডাক, মহান বিজয় দিবস সংখ্যা, ১৬ ডিসেম্বর ২০১১), ৮. আদর্শ মানবিক মূল্যবোধ তৈরির কোনো বিকল্প নেই (দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ, ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭), ৯. মাতৃভাষা এবং বাঙালি হিসেবে আমাদের আত্মপরিচয় (দৈনিক সিলেটের ডাক, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯), ১০. বাংলার ভাষা আন্দোলন ও এর আন্তর্জাতিকতা (দৈনিক সিলেটের ডাক, তারিখ অসংরক্ষিত), ১১. খাদিজা হত্যা চেষ্টা এবং মানবীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় (দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ, ২৪ অক্টো. ২০১৬), ১২. বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (দৈনিক সিলেটের ডাক, ৩০ জানু. ২০১৪), ১৩. বিগত কবি দিলওয়ার আগত কবি দিলওয়ার (দৈনিক সিলেটের ডাক, ২৪ নভে. ২০১৩), ১৪. ইভটিজিং: আধুনিক সমাজের বাই-প্রোডাক্ট (দৈনিক সিলেটের ডাক, ২৫ অক্টো. ২০১০), ১৫. বিবাহ (ছোট গল্প, দৈনিক সিলেটের ডাক, তারিখ অসংরক্ষিত), ১৬. সৈয়দ মুজতবা আলী: একজন প্রায় বিস্মৃত সাহিত্যিক (দৈনিক সিলেটের ডাক, ধারাবাহিক: ৬ মার্চ ও ১৭ এপ্রিল ২০১১), ১৮. বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষা: আক্রান্ত শিশুরা (দৈনিক সিলেটের ডাক, ১৮ জানু. ২০১৪), ১৯. আমাদের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা: সরকারি-বেসরকারি কলেজ (দৈনিক সিলেটের ডাক, ২২ জানু. ২০১২), ২০. ফিলিস্তিন ট্র্যাজেডি: ব্যর্থতার নির্লজ্জ ইতিহাস (দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ, তারিখ অসংরক্ষিত), ২১. শার্লি হেবদো: বিকৃত মানসিকতা (দৈনিক সিলেটের ডাক, ২৩ জানু. ২০১৫), ২২. দুনিয়ার স্বরূপ (দৈনিক সিলেটের ডাক, ১৮ নভে. ২০১৬); ২৩. ইসলাম মুক্তির একমাত্র পথ (দৈনিক সিলেটের ডাক, ধারাবাহিক, রামাদান- ২০১৪), ২৪. খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল: কারো জীবনই নিরাপদ নয় (দৈনিক সিলেটের ডাক ও প্রথম আলো, তারিখ অসংরক্ষিত), ২৫. পুঁথিগত ধর্মীয় শিক্ষায় ধর্মের মর্মবাণীর বাস্তব প্রতিফলন কতটুকু

(দৈনিক সিলেটের ডাক, তারিখ অসংরক্ষিত), ২৬. আজব মানুষের দেশে (দৈনিক সিলেটের ডাক, ৩ মে ২০১০; দৈনিক প্রথম আলো, তারিখ অসংরক্ষিত), ২৭. পাহাড়জলের দেশে (ভ্রমণ কাহিনী), ধারাবাহিক- দৈনিক সিলেটের ডাক, তারিখ অসংরক্ষিত, ২৮. রমযান মাস আমাদের কাছে কী দাবি করে (দৈনিক সিলেটের ডাক, ২৭ জুন ২০১৪) ।

Orcid Id: https://orcid.ord/0000-0003-1403-209X
Google Scholar: Dr. Mohammed Shamim Khan

ISBN : 978-984-99987-8-5